অনুসন্ধানী

কীভাবে হবেন জনগণের কণ্ঠস্বর

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য

একটি নির্দেশিকা

KONRAD ADENAUER STIFTUNG

IJM INVESTIGATIVE JOURNALISM MANUAL

MRDI

FOJO:MEDIA INSTITUTE Linnæus University

সৈয়দ নাজাকাত এবং কেএএস মিডিয়া প্রোগ্রাম এশিয়া সম্পাদিত

আমাদের সম্পর্কে

দি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ম্যানুয়াল (আইজেএম) হলো কনরাড-অ্যাডেনাওয়ার-স্টিফটুং (কেএএস)-এর একটি প্রকল্প। ওয়াচডগ সাংবাদিকতাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে এটি ডিজাইন করেছে কেএএস মিডিয়া প্রোগ্রাম এশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং সহযোগিতা করেছে কেএএস মিডিয়া প্রোগ্রাম দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, সোফিয়া, বুলগেরিয়া। আমরা ম্যানুয়ালটি ক্রমাগত হালনাগাদ করে যাচ্ছি এবং একই সঙ্গে যত বেশি সম্ভব ভাষায় অনুবাদেরও চেষ্টা করছি।

অনলাইনে হালনাগাদ অবস্থা সম্পর্কে জানতে দেখুন:
www.investigative-manual.org

কনরাড-অ্যাডেনাওয়ার-স্টিফটুং (কেএএস) একটি জার্মান রাজনৈতিক ফাউন্ডেশন। এর নামকরণ করা হয়েছে জার্মানির প্রথম চ্যান্সেলর কনরাড-অ্যাডেনাওয়ারের নামে, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হত্যাযজ্ঞের ট্রমা-পরবর্তী সময়ে জার্মানিকে পথ দেখানো এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সারা বিশ্বে ১২০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে কেএএস আজ গণতন্ত্র, সামাজিক বাজার অর্থনীতি ও আইনের শাসনের বৈশ্বিক প্রবক্তা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১
০৬ সংজ্ঞা
যেভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিক হবেন

অধ্যায় ২
১৬ পর্যবেক্ষণ
খবরের সন্ধানে

অধ্যায় ৩
২৬ পরিকল্পনা
পরিকল্পনা তৈরি

অধ্যায় ৪
৪৬ সুরক্ষা
তথ্য-উপাত্ত সুরক্ষার কৌশল

অধ্যায় ৫
৬০ গবেষণা
গবেষণা, গবেষণা, গবেষণা

অধ্যায় ৬
৭৬ সাক্ষাৎ
যেভাবে পাবেন ভেতরের খবর

অধ্যায় ৭
৯০ প্রশ্ন
যথাযথ প্রশ্ন করা

অধ্যায় ৮
১১০ লেখা
প্রতিবেদন লেখা

অধ্যায় ১

অনুসন্ধানী সাংবাদিক যেভাবে হবেন

এই অধ্যায়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার রীতিনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো সংজ্ঞায়িত হয়েছে। পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে অনুসন্ধানী ও রোজকার সাংবাদিকতার মধ্যে। একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কোন কোন গুণ ও দক্ষতা থাকতে হয় এবং অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি কী হতে পারে, তা-ও জানা যাবে এই অধ্যায় থেকে।

পানামা পেপারস, চার্চের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক যৌন নিপীড়ন নিয়ে বোস্টন গ্লোবের উন্মোচন, ওয়াটারগেট; অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কথা চিন্তা করলে এমন কয়েকটি উদাহরণই মাথায় আসে। এই প্রতিবেদনগুলো নাড়া দেয়, নতুন কিছু উন্মোচন করে এবং কখনো কখনো পরিবর্তনও আনে।

কিন্তু সাড়া জাগানো এসব প্রতিবেদন কীভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে?

ব্রিটিশ লেখক জর্জ অরওয়েল যেমনটি বলেছেন, 'সাংবাদিকতা হলো এমন কিছু প্রকাশ করা, যা অন্য কেউ প্রকাশ করতে চাইবে না। বাকি সবকিছু জনসংযোগ।' সাংবাদিকতার বেশির ভাগ কাজে, এমনকি প্রতিদিনের ব্রেকিং নিউজের কাজেও অনুসন্ধানের উপাদান থাকে। কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলা যেতে পারে এমন কোনো কিছুকে, যেখানে একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে লম্বা সময় ধরে গভীর, বিশ্লেষণধর্মী কাজ করা হয়। এই কাজে কয়েক মাস বা বছরও লেগে যেতে পারে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা একটি খবরের গভীরে গিয়ে তুলে আনেন দুর্নীতি, পর্যালোচনা করেন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, অথবা কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক প্রবণতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। একা হোক বা দল বেঁধে– অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা একটি বিষয় নিয়ে গবেষণায় কয়েক মাস, এমনকি বছরও ব্যয় করতে পারেন। প্রচলিত খবরের ক্ষেত্রে যেখানে সাংবাদিকেরা সরকার, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থার সরবরাহ করা তথ্যের ওপর নির্ভর করেন, সেখানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রতিবেদক নির্ভর করেন তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে সংগ্রহ করা তথ্যের ওপর। হয়তো তিনি অনেক নথিপত্রসহ কোনো ই-মেইল পেতে পারেন বা দীর্ঘদিনের পরিচিত কোনো সূত্র তাঁকে কোনো করপোরেট ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে জানাতে পারেন। যেকোনো ক্ষেত্রে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার লক্ষ্য হলো জনস্বার্থে এমন কিছু উন্মোচন করা, যা ইচ্ছা করে বা অনিচ্ছায় গোপন রাখা হয়েছিল।

'জনস্বার্থ' বোঝার একটি কার্যকর উপায় হলো এমন কোনো বিষয়, যা না জানার কারণে একটি জনগোষ্ঠী অসুবিধায় পড়ে, অথবা জেনে (বস্তুগতভাবে বা তথ্য জেনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে) উপকৃত হয়। কখনো কখনো একটি জনগোষ্ঠী কোনো তথ্য জানার কারণে উপকৃত হলেও আরেকটি গোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একটি উদাহরণ: বনজীবীরা যদি জানেন, খোলাবাজারে কত চড়া দামে কাঠ বিক্রি হয়, তাহলে তাঁরা কাঠ ব্যবসায়ীদের কাছে গাছের দাম বেশি চাইতে পারেন। কিন্তু কাঠ ব্যবসায়ীরা চান কম দামে গাছ কিনতে। তাই তাঁরা কাঠের বাজারমূল্য গোপন রাখতে চান। কারণ, তা না হলে গাছের দাম বেড়ে যেতে পারে। একটি প্রতিবেদনের কারণে গোটা দেশকে উপকৃত হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। আর প্রায়ই 'জনস্বার্থ'কে 'জাতীয় স্বার্থ' থেকে আলাদা হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। পরবর্তী বিষয়টি অর্থাৎ 'জাতীয় স্বার্থ' শব্দটি সরকার কখনো কখনো অবৈধ, বিপজ্জনক বা অনৈতিক কাজকে বৈধতা দিতে অথবা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রতিবেদন করা থেকে নিরুৎসাহিত করতে ব্যবহার করে থাকে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হুট করে হয় না। একে গড়ে তুলতে হয় ধীরে ধীরে– পরিকল্পনা, গবেষণা ও প্রতিবেদনের একেকটি ধাপ পেরিয়ে, এবং তথ্যপ্রমাণের নির্ভুলতা নিশ্চিত করার স্বীকৃত মান মেনে। গবেষণা নানা রকম হতে পারে; তা সে ছদ্মবেশ ধারণ করা হোক, অথবা ডেটা মাইনিং করে একটি উপসংহারে আসা। ফলাফল যা-ই হোক না কেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিছক সোর্সের দেওয়া টিপস বা প্রাথমিক তথ্য যাচাইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; তাকে আরও অনেক দূর যেতে হয়। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এমন কিছু উন্মোচন করতে হয়, যা এত দিন অজানা ছিল কিংবা পুরোনো তথ্যকে এমনভাবে সাজাতে হয় যেন তা নতুন কোনো তাৎপর্য তুলে ধরে। একক সোর্স থেকে আপনি চমকপ্রদ তথ্য পেতে পারেন, যে গোপন খবর তিনি না জানালে হয়তো আড়ালেই রয়ে যেত। কিন্তু সেই তথ্যকে যতক্ষণ না নিজের সরেজমিন অভিজ্ঞতা, নথিপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রের সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে এবং তার সত্যিকারের অর্থ জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অনুসন্ধান বলা যাবে না।

রোজকার সংবাদ প্রতিবেদনের তুলনায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সম্পদ, জনবল ও সময়– সবই বেশি লাগে। অনেক প্রতিবেদন দল হিসেবে করতে হয়। কিন্তু ছোট, স্থানীয় ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক গণমাধ্যমের জন্য বিষয়টি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এসব প্রতিষ্ঠানে কাজের জন্য সময়, অর্থ, কর্মী এবং বিশেষায়িত দক্ষতা– সবকিছুরই ঘাটতি থাকে, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এমন অবস্থায় অনুসন্ধানকে এগিয়ে নিতে একজন প্রতিবেদকের অনুদান প্রয়োজন হতে পারে এবং তাঁকে বার্তাকক্ষের বাইরের বিশেষজ্ঞ দক্ষতা ব্যবহারের কৌশলও শিখতে হতে পারে।

> **দলগত কাজের পক্ষে ও বিপক্ষে কঙ্গোলিজ সাংবাদিক সেজ-ফিদেল গায়ালার বিশ্লেষণ**
>
> ‘ছোট দলে কাজ করার সময় নিশ্চিত করতে হয়, যেন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর এক-একটি বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থাকে। একজন মাঠপর্যায়ে মূল তদন্ত করবেন, আরেকজন গবেষণায় ও প্রামাণ্য উপাদান সংগ্রহে দক্ষ হবেন এবং তৃতীয়জন প্রতিবেদনটি লিখবেন। এতে একটি দলের পক্ষে দ্রুত কাজ করা এবং প্রতিবেদন সবার আগে সময়োচিতভাবে প্রকাশ করার ভালো সম্ভাবনা থাকে। তবে মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন দেশের যেসব বার্তাকক্ষে আমরা কাজ করি, সেখানকার পরিবেশ সব সময় স্বচ্ছ থাকে না। শিল্প খাত, ব্যবসা বা নীতিনির্ধারকদের পেতে রাখা ফাঁদে বার্তাকক্ষের অনেকেই পা দিয়ে থাকতে পারেন। এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হুমকি বা ‘সাংবাদিক কেনার’ বিষয়ও থাকতে পারে। এমনকি আমাদের অনেক পত্রিকার নিজেদেরই সন্দেহজনক উৎস রয়েছে, যেখানে তারা শুরুতে এক বা একাধিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে কখনো কখনো সম্পাদকেরা যেমন প্রাথমিক লক্ষ্যে পরিণত হন, তেমনি কখনো কখনো তাঁরাই প্রধান অপরাধীর ভূমিকা নেন। এই পরিস্থিতিতে যখন কোনো তরুণ সাংবাদিককে কাজ করতে হয়, তখন তাঁর পক্ষে একটি অনুসন্ধানী প্রকল্প শেষ করতে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়।’

অনুসন্ধানী সাংবাদিক কি গোয়েন্দা

অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও গোয়েন্দাদের দক্ষতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। প্রতিটি অনুসন্ধান একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়। সাংবাদিক প্রথমে একটি হাইপোথিসিস বা অনুমান দাঁড় করান। তারপর আরও গবেষণা করেন: প্রচুর নথিপত্র খুঁজতে থাকেন, বিভিন্ন সাক্ষাৎকার নেন, যা কখনো কখনো জিজ্ঞাসাবাদের মতো মনে হতে পারে এবং অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো করেন, যার কিছু কিছু অত্যন্ত বিশদ বা কারিগরি।

কোন সাক্ষ্যটি শেষ পর্যন্ত নিশ্ছিদ্র প্রমাণ হিসেবে বৈধ বলে গণ্য হবে, তা যাচাইয়ের জন্য সাংবাদিকেরাও স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেন, ঠিক আদালতে যেমন হয়। যেহেতু মানহানির মতো আইন আছে, তাই আদালতে মামলা চালানোর জন্য কোনো গোয়েন্দা যে ধরনের তদন্ত ও তথ্যের সত্যতা যাচাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন, একজন সাংবাদিকের তদন্তও তেমনটাই হতে হয়।

প্রশ্ন হলো, পরিচয় গোপন করে কিংবা গোয়েন্দাদের মতো লুকানো মাইক্রোফোন বা ক্যামেরা ব্যবহার করা একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের উচিত কি না। এর উত্তর বেশ জটিল। অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা, বিশেষত এ ধারার সেরা প্রতিবেদকদের কেউ কেউ এসব কৌশল ব্যবহার করেন। কিন্তু মনে রাখা জরুরি, গোয়েন্দারা পরিচয় লুকিয়ে কাজ করবেন কি না এবং পুলিশি তদন্তের সময় নাগরিক কোন কোন অধিকার ভোগ করবেন, তা সাধারণত আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত থাকে। কিন্তু সাংবাদিক এ ধরনের কাজের বেলায় নিজের নৈতিক বোধের ওপর নির্ভর করেন। একই সঙ্গে মাথায় রাখতে হয়, সাংবাদিকেরাও ব্যক্তি-গোপনীয়তা (প্রাইভেসি) আইনের আওতামুক্ত নন। তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের এ ধাঁচের কাজ করার আগে প্রতিটি পরিস্থিতিকে সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করতে হয়, যাতে সাংবাদিকতার নৈতিক মান বজায় থাকে এবং আইনভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি এড়ানো যায়। গোপন ক্যামেরা ও রেকর্ড কখনোই মূল সাক্ষ্যপ্রমাণের বিকল্প নয়, বরং তার সঙ্গে বাড়তি হিসেবে যুক্ত হতে পারে। মূল সাক্ষ্যপ্রমাণ বিশ্লেষণ, তা যাচাই ও পটভূমি ব্যাখ্যার মাধ্যমেই প্রতিবেদন অর্থবহ হয়। উন্মুক্ত নথি (সরকার বা প্রতিষ্ঠান যেসব তথ্য সবার জন্য প্রকাশ করে রেখেছে) ঘেঁটেই ভূরি ভূরি প্রমাণ হাতে পাওয়া সম্ভব, শুধু জানা চাই কোথায় খুঁজতে হবে এবং কীভাবে এগুলোকে একটির সঙ্গে আরেকটি সংযুক্ত করতে হবে।

একজন গোয়েন্দা ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজে অনেক মিল থাকলেও তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। কখনো কখনো সাংবাদিকসুলভ অনুসন্ধানের লক্ষ্য কাউকে দোষী প্রমাণ করা নয়, বরং শুধুই ঘটনার সাক্ষ্য দেওয়া। অপরাধ কে করেছে, তা প্রমাণ করতে পারলেই গোয়েন্দার কাজ শেষ হয়। কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে শুধু অনিয়মকারীকে অভিযুক্ত করা হয় না, বরং নানা ঘটনার মধ্যে সংযোগও উন্মোচন করা হয়। ফলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন শুধু অভিযুক্তের দিকে আঙুল তাক করে না, বরং ঘটনার প্রতিটি আঙ্গিক ও প্রসঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হাজির করে। নিজেদের কাজে এতটা গভীরে যেতে পারলে প্রতিবেদক কাজটির বস্তুনিষ্ঠতার প্রশ্নে সংশয়মুক্ত হতে পারেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে 'জার্নালিজম অব আউটরেজ'ও (যে সাংবাদিকতা ক্ষোভ জাগায়) বলা হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দুই পক্ষের মধ্যে কৃত্রিমভাবে ভারসাম্য তৈরির চেষ্টা করে না, বরং যে প্রতিবেদন করা হবে, তার বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করাতেই এখানে বেশি জোর দেওয়া হয়। 'আমাদের ভুল হতে পারে', বা 'আমাদের বুঝতে ভুল হতে পারে'– এমন ধরনের কোনো বাকচাতুরীর সুযোগ এখানে নেই। এমন কোনো সন্দেহ থেকে থাকলে বুঝতে হবে যে, অনুসন্ধান যথেষ্ট গভীরে যায়নি এবং খবরটি এখনো ছাপার উপযোগী হয়ে ওঠেনি। একটি প্রতিবেদনের কখনোই দুটিমাত্র দিক থাকে না। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ভারসাম্যটি আসে বহু মতকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে এবং কী ঘটেছে– এর পাশাপাশি কেন ঘটেছে, তা তুলে ধরার মাধ্যমে। একজন গোয়েন্দা বিভিন্ন ঘটনাকে সূত্রবদ্ধ করে সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যার বিষয়টি অভিযুক্তের আইনজীবীর ওপর ছেড়ে দেন, সেখানে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে পুরোটাই ব্যাখ্যা করতে হয়।

অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা অনেকটা বিজ্ঞানীর মতো কাজ করেন। একটি প্রতিবেদনের ধারণাকে সমর্থন করার মতো যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ জড়ো করার আগ পর্যন্ত তাঁকে চোখ-কান খোলা রেখে কাজ করার নীতিতে চলতে হয়। এর মানে হচ্ছে, প্রতিবেদকের ধারণার বিরুদ্ধে যায় এমন প্রমাণকে অগ্রাহ্য না করা এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ভিন্ন দিক নির্দেশ করলে উপসংহার বদলের মানসিকতা থাকা। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের ব্যবস্থাপকও বলা চলে। গভীর গবেষণা প্রয়োজন– এমন বড় ও দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বিশেষজ্ঞসহ দলের অন্য সদস্যদের নিয়ে প্রতিবেদনবিষয়ক পরিকল্পনার পেছনে লেগে থাকতে হয়। এ কারণে তাঁদের স্পষ্ট যোগাযোগ-কৌশলের পাশাপাশি দলীয়ভাবে কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে যত ভুল ধারণা

ভুল ১ **এটি গ্ল্যামারাস**

সম্ভবত এ কারণেই 'অল দ্য প্রেসিডেন্ট'স মেন'-এর প্রচ্ছদে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি উন্মোচন করা সাংবাদিকদের কোনো ছবি নেই। ছবি আছে তাঁদের চরিত্রে অভিনয় করা দুই তারকা রবার্ট রেডফোর্ড ও ডাস্টিন হফম্যানের। তাই ভ্রান্তিবিলাসে থাকবেন না। বাস্তবতা বলছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কঠিন, নিরস এবং কখনো কখনো বিপজ্জনক।

ভুল ২ **সাংবাদিকেরা তাঁদের প্রতিবেদনের চেয়েও বড়**

অহংকার ভুলে যান। মনে রাখবেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মূলত জনসেবা। অনুসন্ধানী সাংবাদিক হয়েছেন বলে পেশার নৈতিক মানকে অবজ্ঞা করার কোনো অধিকার আপনার নেই।

ভুল ৩ **অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা নিঃসঙ্গ প্রহরীর মতো**

সিনেমায় যেমন একজন নায়ক থাকেন, মনে হয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায়ও বুঝি একজনকে ঘিরেই যাবতীয় কাজ পরিচালিত হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়; দলীয় প্রচেষ্টা ছাড়া অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ঠিক টেকসই হয় না।

ভুল ৪ **বেসরকারি গণমাধ্যমই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করে**

এটি আংশিক সত্য। কিন্তু এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে সরকারি গণমাধ্যমই সরকারের বিরুদ্ধে বড় বড় অনুসন্ধান চালিয়েছে।

ভুল ৫ **অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দৃষ্টি শুধু মন্দ খবরের দিকে**

অন্যায় খুঁজে বের করা এবং তা শোধরানোই কোনো জনগোষ্ঠী ও তার সেবক গণমাধ্যমের অগ্রাধিকার। কিন্তু ইতিবাচক সংবাদকে সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কে নেতিবাচক ভাবমূর্তি দূর করাটাও ভালো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভিত্তি হতে পারে। বরং বিখ্যাত ব্যক্তির ভাবমূর্তিতে 'কালিমা লেপন' বা চরিত্র হনন ঘরানার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় মানুষ অখুশি হয়। কারও জীবনে অন্যদের নাক গলাতে উৎসাহ দেওয়া ছাড়া কুৎসা রটনার আর কোনো অর্থই হয়তো নেই। সত্যিকারের অনুসন্ধানে উঠে আসা কেলেঙ্কারিকে অবশ্যই ব্যক্তিগত গণ্ডি ছাপিয়ে বড় কোনো কিছুতে পৌঁছাতে হবে, যা কিনা জনস্বার্থের ওপর প্রভাব ফেলছে।

ভুল ৬ **অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মানে নেহাতই ভালো সাংবাদিকতা**

এই সংজ্ঞার মূলে রয়েছে সেই প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, যা সাংবাদিক বলতেই বোঝে 'সতর্ক প্রহরী', যাঁর কাজই হচ্ছে অন্যায় খুঁজে বের করা, দোষীদের চিহ্নিত করা এবং এমনভাবে প্রতিবেদন করা, যাতে পরিবর্তন ঘটে। এটি অবশ্যই তাঁদের দায়িত্বের একটি অংশ। দুর্নীতিবাজদের প্রতিহত করাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন– শুধু অপরাধকেই শনাক্ত করে, এমন অপরাধের সুযোগ করে দেয় যে ক্রটিপূর্ণ ব্যবস্থা, তাকে শনাক্ত করতে না পারে, তবে তা আদতে নতুন আরেক দল অপরাধীর জন্য একই ধরনের অপরাধ করার পথ প্রশস্ত করে (এমনকি এই অপরাধ সংঘটনের উত্তম উপায়টিও হয়তো বাতলে দেয়)। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে মূল সমস্যা শনাক্তের পাশাপাশি সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করতে হয়। যারা ক্ষমতাসীন, তারা ব্যর্থ হলে তারও কারণ অনুসন্ধান করে ফলোআপ প্রতিবেদন করতে হয়।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন কেন করবেন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। দৈনন্দিন ঘটনাবলির ওপর যখন মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে পত্রিকা বের করা যায়, তখন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে এ ধরনের কঠিন কাজের জন্য সম্পাদককে রাজি করানোর প্রশ্ন আসে।

তাহলে এটি করবেন কেন? কারণ, নির্ভুল তথ্য, খুবই দারুণভাবে গল্পের মাধ্যমে বলতে পারলে তা পরিবর্তন আনতে পারে। গত কয়েক বছরের পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী প্রতিবেদনগুলো দেখলেই বোঝা যায়, কীভাবে একটি ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিভিন্ন কমিউনিটি বা পলিসিতে প্রভাব রাখতে পারে। ২০১৮ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিল ওয়াশিংটন পোস্ট। তারা উন্মোচন করেছিল অ্যালাবামার এক সিনেট প্রার্থীর অতীত যৌন হয়রানির ঘটনার অভিযোগ। এবং এটি সিনেট নির্বাচনের দৃশ্যপট পাল্টে দিয়েছিল। ২০১৭ সালে পুলিৎজার জিতেছিলেন চার্লেসটন গ্যাজেট-মেইলের প্রতিবেদক এরিক আয়ার। তিনি দেখিয়েছিলেন, কীভাবে পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় বিপুল পরিমাণ আফিমজাতীয় নেশা-পণ্য ঢুকছে। এবং ২০১৬ সালে পুরস্কারটি জিতেছিলেন ফ্লোরিডার দুটি ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্রের দুজন প্রতিবেদক। তাঁরা একজোট হয়ে অনুসন্ধান করে দেখিয়েছেন, কীভাবে অঙ্গরাজ্যের মানসিক হাসপাতালগুলোতে সহিংসতা বাড়ছে।

তদুপরি, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রশ্ন ছাড়াই সরকারি ভাষ্যের ওপর নির্ভর করে প্রতিবেদন তৈরির মানে, ক্ষমতাসীনদের হাতে এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার তুলে দেওয়া। জনমতের প্রতিনিধিত্ব, জবাবদিহি ও সরকারের স্বচ্ছতার মতো গণতান্ত্রিক মূলনীতিগুলোয় ধস নামে, যখন গণমাধ্যম বিভিন্ন পক্ষের পাল্টাপাল্টি দাবির যথার্থতা যাচাইয়ে কঠিন প্রশ্নগুলো করে না কিংবা তথ্য ও বিশ্লেষণ হাজির করে না।

কীভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিক হওয়া যায়

অনুসন্ধানী সাংবাদিক হুট করে হওয়া যায় না। কিন্তু তাঁদের সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এগুলোর প্রতি যত্নবান হোন, তাহলে দেখবেন আপনি আপনার পরবর্তী কোনো বড় প্রতিবেদনের পথে এগিয়ে গেছেন। এখানে থাকছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

সাহস

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আপনাকে অনেক অন্ধকার পথে নিয়ে যাবে। আপনি এমন সব গোপন বিষয় সামনে আনবেন, যা অনেকেই চায় না। আপনি হয়তো কর্তৃপক্ষের চাপের শিকার হবেন। আপনার বস সেন্সরশিপ আরোপ করতে পারেন, এমনকি কিছু সময় মৃত্যুর হুমকিও পেতে পারেন। এগুলোর মধ্যে টিকে থাকতে গেলে অনেক সাহস দরকার।

কৌতূহল

প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় সাংবাদিকতার মৌলিক পাঁচ 'ডব্লিউ' এবং এক 'এইচ' প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার সক্ষমতা থেকেই শুরু হয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। এই প্রশ্ন থাকতে পারে কোনো ঘটনায়, সংবাদে কিংবা দৈনন্দিন জীবনে যা শুনছেন বা দেখছেন, তার ভেতরেই।

আবেগ

সাংবাদিকতা করে আপনি হয়তো ধনী হতে পারবেন না। এবং এটি আপনার অনেক সময় ও শক্তি খরচ করবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিক হওয়ার মানে আপনি হয়তো ক্ষমতাবান মানুষদের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছেন। এবং কিছু ক্ষেত্রে আপনার জীবনকেও ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছেন। আপনি এই কাজ করছেন; কারণ, আপনার লক্ষ্য আরও বড়। সেটি হতে পারে সত্য উন্মোচন, ন্যায়বিচার বা হয়তো কোনো কণ্ঠহীনের কথা তুলে আনা।

উদ্যোগ

অনেক বার্তাকক্ষই চলে সীমিত সম্পদ নিয়ে এবং তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলতে হয়। তাই কোনো সংবাদ সম্মেলনে পাওয়া অনুসন্ধানী আইডিয়াকে সব সময় রাতারাতি এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় না, বিশেষ করে যদি সেখানে তথ্যের ঘাটতি বা অস্পষ্টতা থাকে। অনুসন্ধানী সাংবাদিককে উদ্যোগী হতে হয়, করতে হয় নিজস্ব গবেষণা এবং সেই ধারণাকেই একটি প্রতিবেদনের জন্য পরিকল্পনা আকারে দাঁড় করাতে হয়। প্রতিষ্ঠান তারপরও আগ্রহী না হলে কাজটি সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়ার (হতে পারে তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল) উৎসগুলো খুঁজতে তাকেই উদ্যোগী হতে হয়।

বিচক্ষণতা

বেফাঁস কথা পুরো অনুসন্ধানকাজ এবং এর সঙ্গে যুক্ত সবার জীবনকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। একই সঙ্গে এটি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সুযোগ করে দিতে পারে, যারা প্রতিবেদনটিই বাগিয়ে নিতে পারে কিংবা সম্ভাব্য সাক্ষাৎকারদাতাদের আগেই সতর্ক করে দিতে পারে। মনে রাখবেন: বেফাঁস কথায় জাহাজও ডোবে।

ন্যায্যতা ও নৈতিকতা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তথ্য সরবরাহকারী সূত্রের নিরাপত্তা, কর্মক্ষেত্র, এমনকি জীবনের জন্যও ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এমনকি কাণ্ডজ্ঞানহীন অভিযোগ অভিযুক্তকেও একই ধরনের ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। তাই একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের দৃঢ় ও সুচিন্তিত ব্যক্তিগত নৈতিক অবস্থান থাকা জরুরি, যাতে তথ্যের উৎস ও প্রতিবেদনের কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তি– উভয়ের মর্যাদাই যতটা সম্ভব রক্ষা করা যায় এবং তাঁরা ক্ষতির হাত থেকে সুরক্ষা পান। পাশাপাশি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে বার্তাকক্ষেরও একটি নৈতিক বিধির মধ্যে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে একই সঙ্গে নীতিগত প্রশ্নে কোনো সংশয় দেখা দিলে তা আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা থাকে।

যৌক্তিক চিন্তা, সংগঠন ও শৃঙ্খলাবোধ

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে সময় একটি বড় বিষয়। কখনো কখনো এতে আইনি ঝুঁকি থাকে। তাই সূক্ষ্মভাবে তথ্য যাচাই করা জরুরি। সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে তাই আপনাকে পরিকল্পনা করতে হবে সতর্কতার সঙ্গে। একই সঙ্গে সত্যতা যাচাই এবং বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায়ও মনোযোগী হতে হবে।

বিস্তৃত সাধারণ জ্ঞান ও গবেষণায় দক্ষতা

সংশ্লিষ্ট ঘটনা, তথ্য ও প্রশ্নগুলোকে শনাক্ত করার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানের প্রাসঙ্গিকতার অনুধাবন পণ্ডশ্রম এড়াতে সহায়ক হতে পারে। অনুসন্ধান যদি কোনো অজানা দিকে নিয়ে যায়, তাহলে অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অবশ্যই সেই দিকটির ইতিহাস, পরিভাষা, নিয়মাবলি ও মূল ব্যক্তিদের সম্পর্কে দ্রুততার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা, সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবহার থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় বই শনাক্ত ও সংগ্রহ করে তা পড়া– সবই এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পড়ার অভ্যাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি হয়তো জানেনই না, একটি খুব ছোট তথ্যও আপনার অনুসন্ধানে কতটা কাজে আসতে পারে।

নমনীয়তা

অনুসন্ধান অপ্রত্যাশিত দিকেও মোড় নিতে পারে। কখনো কখনো প্রথম প্রশ্নটি অন্ধগলিতে গিয়ে পৌঁছাতে পারে। আবার গৌণ প্রশ্নটিই আরও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী নয় এমন নতুন প্রশ্নের জন্ম দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কর্তব্য হচ্ছে নিজের গবেষণার বিষয়ে নতুন করে ভাবা, নতুন পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং কোনোভাবেই প্রাথমিক ধারণায় বদ্ধমূল না থাকা।

দলীয় স্পৃহা ও যোগাযোগ দক্ষতা

চলচ্চিত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিককে প্রায়শই 'নিঃসঙ্গ শেরপা' হিসেবে দেখানো হয়। কখনো কখনো এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়, যখন গোপনীয়তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং যথাযথ সুরক্ষার নিশ্চয়তা পাওয়ার আগ পর্যন্ত যা অন্যদের জানানো যায় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বার্তাকক্ষের ভেতরের (এমনকি বাইরের) সব দক্ষতার সমন্বয় ও সহযোগিতাতেই সবচেয়ে ভালো প্রতিবেদনটি তৈরি হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় 'স্পটলাইট' নামের দলটির সাফল্যের কথা, যারা ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে শিশু যৌন নিপীড়নের ঘটনাটি নিয়ে অনুসন্ধান করেছিল। একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতি ও সমাজবিদ্যার মতো যেকোনো বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন হতে পারে। আর জ্ঞানের পরিসর যত বড়ই হোক না কেন, একজন সাংবাদিকের পক্ষে এই সব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচিতজন এবং তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ দলবদ্ধ কাজের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকটি হলো ভালোভাবে বোঝানোর ক্ষমতা, যা অনুসন্ধানী উদ্যোগে অংশ নেওয়া সবাইকে প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও মানদণ্ড (যথার্থতা, সততা, গোপনীয়তা ইত্যাদি) বুঝতে সাহায্য করে।

এই অধ্যায়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞা ও জনস্বার্থে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকের পক্ষে তাঁর সম্পাদককে অনুসন্ধানমূলক কাজে রাজি করানো সব সময় যে সহজ নয়, সে বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধানের সম্ভাব্য ফল কতটা আশাপ্রদ হবে, এটি মূলত তাঁর ওপরই নির্ভর করে। পরবর্তী অধ্যায়ে তাই খবরের বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাওয়া এবং ভুয়া তথ্যে বিভ্রান্ত না হওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২

অধ্যায় ২

খবরের সন্ধানে

প্রতিটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন শুরু হয় একটি ধারণা থেকে। কোথায় সেসব ধারণা মিলবে, এই অধ্যায়ে তা-ই ব্যাখ্যা করা হবে। পত্রিকা পড়া, সূত্রের সঙ্গে আলাপ, প্রভাবশালী ব্যক্তির সাক্ষাৎকার কিংবা চারদিকে নানা ধরনের ঘটনাপ্রবাহের ওপর চোখ-কান খোলা রাখলে সম্ভাব্য খবরের ধারণা মেলে। এই অধ্যায়ে ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নেটওয়ার্কগুলোর ওপরও আলোকপাত করা হবে। কারণ, এসব মাধ্যম ব্রেকিং নিউজ এবং প্রধান প্রধান খবরের ওপর নজর রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ইচ্ছেমতো আরাম-আয়েশ করার সুযোগ নেই। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে অজানা বিষয়ে অনুসন্ধান এবং পরিকল্পিত ঝুঁকি গ্রহণই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ।

স্টোরি আইডিয়া কীভাবে পাবেন

অধিকাংশ খবরের আইডিয়া বা ধারণা জন্মায় সাংবাদিকের নিজের আগ্রহের জায়গা থেকে। আগের প্রতিবেদন বা চলমান ঘটনাগুলোর মধ্যে থাকা প্রশ্ন থেকেই এই ধারণা তৈরি হয়। কোনো বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বিষয়টিতে আপনার উৎসাহ তৈরি হতে পারে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কারও সঙ্গে আলাপচারিতা কিংবা কারও কাছ থেকে শোনা কোনো মন্তব্য থেকেও খবরের ধারণা মিলতে পারে। এখানে একটি বিষয় বোঝা জরুরি যে সব সময়ে ও প্রতিবারই ভালো সংবাদের ধারণা মিলবে– বিষয়টা এত সহজ নয়। সাংবাদিকদের কাছে সম্ভবত সবচেয়ে কঠিন কাজই হচ্ছে ভালো একটা ধারণা দাঁড় করানো।

প্রথমত, কোনো প্রতিবেদনের ধারণা হুট করে আপনার কোলে এসে পড়বে, এমন চিন্তা বাদ দিতে হবে। অনেক উঠতি অনুসন্ধানী সাংবাদিকের পেশাগত জীবনের যাত্রা শুরু হয় এমন কল্পনা নিয়ে যে, অন্ধকার গলিতে কেউ এসে তাঁদের হাতে গোপন নথি তুলে দেবে। তাঁদের মনে হয়, একবার তথ্য পেলে সংবাদ ছাপা হবে প্রথম পাতায়। সবকিছু ভালো হলে মোটা হরফে স্বনামে সংবাদটি প্রকাশিত হবে। প্রশংসা, স্বীকৃতি আর পদক-পুরস্কারও জুটবে। অবশ্য, মাঝেমধ্যে এমন ঘটনা ঘটেও। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির খবর অজ্ঞাতনামা একটি সূত্রের দেওয়া তথ্যের মাধ্যমেই সূচিত হয়েছিল, যার জেরে প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু সাধারণত, রাজনৈতিক দুর্নীতির বিষয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির ফোন বা অতি গোপন নথি প্রকাশের ঘটনা খুবই বিরল এবং এসব তথ্য খুব ভালোভাবে যাচাই করে দেখতে হয়। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি যেমন উচ্চপর্যায়ের রাজনৈতিক অসততার নজির, তেমনি প্রতিবেদকদের একাগ্রতা এবং শ্রমেরও একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত, একজন সাংবাদিকের ছুটি বলে কিছু নেই। তাঁদের সব সময়ই চোখ খোলা রাখতে হবে। কাজে যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে বন্ধ হয়ে যাওয়া ড্রেনের দিকেও নজর রাখতে হবে। ইমিগ্রেশন কার্যালয়ের সামনে পাসপোর্ট পাওয়ার অপেক্ষায় মানুষের দীর্ঘ সারি কিংবা হাসপাতালে নার্সদের অসদাচরণ– এমন জায়গা থেকেও প্রতিবেদন বেরিয়ে আসে, যদি তা প্রতিবেদকের নজরে পড়ে। প্রথম নজরে যা দেখা যায়, সেখানে তার চেয়েও বেশি কিছু থাকতে পারে, যা কিছুটা অনুসন্ধান দাবি করে। এ সময় সংবাদ হতে পারে এমন ধারণাগুলো নোট বইয়ে লিখে রাখা উচিত। যা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং যেসব প্রশ্ন আপনার মাথায় এসেছে সেগুলো লিখে রাখুন। ভালো হয় মুঠোফোনে এগুলো রেকর্ড করে রাখলে। ছবি তুলুন, ডায়াগ্রাম আঁকুন এবং তার ডিজিটাল কপিটি সঙ্গে রাখুন, যেন যেখানেই যাচ্ছেন, অনুসন্ধানটিকেও সেখানে সঙ্গে নিতে পারেন।

তৃতীয়ত, নিজের ইন্দ্রিয়ের ওপর ভরসা রাখুন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও লোকজনের সঙ্গে কথা বলার পর কোনো প্রতিবেদক হয়তো এমন কিছু পেয়ে যেতে পারেন, যা অন্য কেউই খেয়াল করেনি। ঘটনাটি আপনার সঙ্গে ঘটেছে বলে যে অনুসন্ধানের গুরুত্ব কমে যাবে, তা নয়। প্রতিবেদকেরা সবচেয়ে ভালো প্রত্যক্ষদর্শী। প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণকে অগ্রাধিকার দিন। আপনার অভিজ্ঞতা দিন শেষে কাজে না-ও আসতে পারে, কিন্তু তাই বলে একটু পরীক্ষা করে দেখার প্রাথমিক ধাপ থেকে সরে আসবেন না।

প্রতিবেদনের ধারণার জন্য পড়াশোনা

আপনি যদি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গুরুত্ব দেন, তাহলে পড়াশোনা করাটা শুধু ইচ্ছার বিষয় নয়, এটি একটি পেশাগত দায়িত্ব। এটি আপনার লেখার দক্ষতাই বাড়ায়। একই সঙ্গে আপনি নানা বই-প্রবন্ধ থেকে বুঝতে পারেন, কীভাবে নানা ব্যবস্থা-পদ্ধতি কাজ করছে। এটি বুঝতে না পারলে কোনটা খারাপ কাজ হচ্ছে, আর কোনটা ভালো, তা ধরতে পারবেন না। আপনার কাছে স্বাভাবিকভাবে যেসব তথ্য আসছে, সেগুলোর পেছনে বেশি সময় ব্যয় না করে বরং আপনার জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে নতুন নতুন তথ্য অনুসন্ধান করা উচিত।

ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স অ্যান্ড এডিটরসের (আইআরই) সাবেক নির্বাহী পরিচালক ব্র্যান্ট হিউস্টন আইআরইয়ের ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স হ্যান্ডবুকের পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অনেক বীজ বহন করে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো। এসব পত্রিকায় প্রকাশিত নাম পরিবর্তন, ক্রয়-বিক্রয়, দরপত্রের মতো আইনি নোটিশে (বিজ্ঞাপন) লুকিয়ে থাকে ভালো সংবাদ-কাহিনি। আপনার কাজ হলো সতর্ক থাকা; কী, কেন হচ্ছে তা খুঁজে বের করা। সাংবাদিকেরা যে কাজটি খুব কমই করেন, তা হলো প্রকাশিত খবরের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে নজর রাখা বা ফলোআপ। পাঠক জরিপ ও ফোকাস গ্রুপ থেকে দেখা গেছে, পাঠকেরা ফলোআপ নিউজ পড়তে বেশি পছন্দ করেন। তাঁরা জানতে চান, ঘটনা-পরবর্তী সময় কী ঘটল। কেন এটা ঘটল। সংক্ষিপ্ত, সাদামাটা প্রতিদিনকার সংবাদের পেছনের ঘটনা কী, সেটা জানতে চান পাঠকেরা। বিশেষভাবে সেসব সংবাদের দিকে নজর দিন, যেখানে ঘটনাটি কেন ঘটেছে, সেই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বা কোনো ঘটনা শুধু একটি আঙ্গিক থেকে তুলে আনা হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী খবর কিংবা নিয়মিত ঘটনা– যেমন বিভিন্ন বৈশ্বিক বা জাতীয় ঘটনার বার্ষিকীকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখারও চেষ্টা করা উচিত। অনেক পড়াশোনা করলে আপনি নীরবে আড়ালে চলে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার দিকেও নজর রাখতে পারবেন। যেমন, অনেক প্রশংসিত কোনো সরকারি নির্মাণ প্রকল্প।

সরকার ও এনজিওর প্রতিবেদনগুলো নিরস মনে হলেও সেগুলো আপনার পড়া উচিত। অপ্রতুল সম্পদ ও ভৌগোলিক কারণে বিদেশি অনেক প্রকাশনা এবং ওয়েবসাইটে আপনার প্রবেশাধিকার সীমিত থাকতে পারে, তবু অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের সম্ভাব্য সব পথ কাজে লাগানো উচিত, যা তাঁকে হালনাগাদ থাকতে সাহায্য করবে। দূতাবাস এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন তথ্যকেন্দ্রে বিনা খরচে পড়ার কক্ষ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ থাকে। সেখানে গিয়ে আপনি এগুলো দেখতে পারেন।

প্রাত্যহিক অনুসন্ধানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রের সূত্রগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা। তাঁদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করা, যেন অন্য প্রতিবেদকেরা খবর পাওয়ার আগেই সেটি আপনি জেনে যান। আর এ জন্য কোনো কারণ ছাড়াই নিয়মিত যোগাযোগ দরকার হয়। যদি আপনি শুধু প্রয়োজনের সময়ই সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাহলে তিনি মনে করতে পারেন, আপনি তাঁকে ব্যবহার করছেন। বিষয়টিকে বলে সূত্রের সঙ্গে কাজ করা। কিন্তু এসব সূত্র থেকেও কোনো প্রতিবেদনের ধারণা এমনিতেই আপনার কাছে এসে পড়বে না। আপনাকে সেগুলো খুঁজে বের করার জন্য সৃজনশীল ও কৌতূহলী হতে হবে।

আপনার যদি সব সময় ইন্টারনেট সুবিধা থাকে, তাহলে আপনি নিউজ সাইট এবং ফেসবুক ও টুইটারের মতো সামাজিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আপনি বিভিন্ন বিষয়ে পক্ষে-বিপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন মতামত পাবেন। সেখান থেকে আপনি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেয়েও যেতে পারেন। টুইটার ফিডগুলো সমসাময়িক ঘটনাবলির বিষয়ের সর্বশেষ ও মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ভান্ডার। ২০১৬ সালের নভেম্বরে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের পুনর্জাগরণ হয়েছে। এখান থেকেই পাওয়া যাচ্ছে প্রেসিডেন্টের অনেক বড় বড় বিবৃতি। সেটি বাদ দিলেও তাৎক্ষণিক নানা সংবাদ পাওয়ার ভালো উৎস হতে পারে এটি। গ্রামীণ এলাকার সাংবাদিকদের জন্য অনেক উপকার হতে পারে, যদি তাঁরা বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্য সাংবাদিককে সামাজিক মাধ্যমে অনুসরণ (ফলো) করেন।

নোট

প্রতিবেদনের ধারণা পরখ করে দেখা

কোনো প্রতিবেদনের আইডিয়া বা ধারণা আপনি যেভাবেই পেয়ে থাকুন না কেন, তার পরবর্তী পদক্ষেপটি হচ্ছে: এটি আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে, তা পরখ করে দেখা। সম্ভাব্য পক্ষপাত ও বাধাবিপত্তি সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

ব্যক্তি অনুভূতি

একটি সংবাদের ধারণা নিয়ে কাজ করার সময় দুটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রথমত, আপনার ব্যক্তিগত অনুভূতি অনুসন্ধানের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। অনুসন্ধানের সময় সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণে আপনি রুষ্ট হয়ে থাকতে পারেন। আর সেই কারণে সংবাদে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়োজনীয় তথ্য উপস্থাপনের পরিবর্তে প্রতিবেদনটি দোষারোপ ও অভিযোগের দিকে চলে যেতে পারে। সাংবাদিকতার মূলনীতিগুলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করুন। বিশ্বস্ত পরামর্শক বা সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলুন। এবং এটি যেন তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সব সময় প্রতিনিধিত্বশীল না-ও হতে পারে। আপনি শুধু একজন। তাই আপনার মতো আরও কত লোক একই সমস্যায় ভুগেছেন, তা বোঝা প্রয়োজন। এখানে কয়েকটি প্রশ্ন আসতে পারে– আপনি একজন সাংবাদিক অথবা একজন পুরুষ কিংবা একজন নারী বা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি হওয়ার কারণে কি বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, অন্যদেরও কি একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে, এই সমস্যা কি প্রতিদিনই ঘটে, কিংবা আজকেরটা কি ভিন্ন– এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো কাটিয়ে ওঠার উপায় হলো একটি একক ঘটনার বাইরে গিয়ে বৃহৎ পরিসরে প্রতিবেদন করা। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরা যায় মতামত কলামে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে নয়। একটি যথার্থ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে হলে সমস্যার কারণ জানতে হবে, পটভূমি বুঝতে হবে এবং বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলতে হবে, যাতে প্রতিবেদনটি কোনো একজনের ব্যক্তিগত ক্ষোভের বদলে সমস্যাটির প্রতিনিধিত্ব করে।

যাঁদের আপনি চেনেন এবং যাঁদের সঙ্গে কাজ করেন, তাঁদের সবার ক্ষেত্রেই এসব সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়টি প্রযোজ্য। হয়তো তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা চরম সত্য, কিন্তু তা প্রতিনিধিত্বশীল না-ও হতে পারে এবং তাতে ব্যক্তিগত অনুভূতির ছাপ পড়তে পারে। এ ছাড়া যে বন্ধুবান্ধব অথবা পরিচিত ব্যক্তি কোনো ঘটনা, সমস্যা বা বিষয়ে সরাসরি জড়িত নন, তাঁদের দেওয়া তথ্যের বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। এ রকম তথ্যের ক্ষেত্রে আপনি যদি কারও নাম-পরিচয় সংগ্রহ করে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে না পারেন, তাহলে মনে করতে হবে, এটি একটি গুজব। এ রকম তথ্য এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তাই আবারও বলছি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেবল একটি ভালো অনুসন্ধানের সূচনা করতে পারে, এর বেশি কিছু নয়।

এ বিষয়ে সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের (সিআইজে) পরামর্শ

> “আপনি এমন অনেক লোককেই চিনতে পারেন, পেশাগত কারণে যাঁরা তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের কথা বলা যায়। তাই চেনা লোকদের আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন, সেই বিষয়ে প্রথমেই চিন্তা করে নিন। এমনটা মনে করবেন না, কেউ একজন বন্ধু বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ ভুলে গিয়ে আপনাকে সাহায্য করবেন। তথ্য প্রকাশ তাঁর জীবনেও বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই কারও ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের আগে সব সময় তাঁর অনুমতি চেয়ে নিন।”

গালগল্প ও গুজব যাচাই

গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এটা ছড়ানোর জন্য রাস্তার পাশের গালগল্প, ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের চটকদার কথাবার্তা, ট্যাক্সিচালক ও যাত্রীদের কথোপকথন, গলফ কোর্সের ক্যাডি, ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক লোকজন, জমির দালাল, পুলিশের সদস্য এবং ক্যাফে ও পানশালার কর্মীর চেয়ে কার্যকর অন্য কোনো মাধ্যম নেই। তবে গালগল্প বা রটনা এবং গুজব আমাদের বাস্তব ঘটনা ও পরিবর্তনের বিষয়ে সজাগ করতে পারে। কোনো এলাকায় নারীদের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কারণ কি মানব পাচার? লোকজন কি ঘরে বানানো চোলাই মদে আসক্ত হতে শুরু করেছে? নামকরা কোনো ব্যবসায়ী কি হঠাৎ করে পয়সাকড়ি খরচ করা বন্ধ করে দিয়েছেন? কিংবা কোনো শীর্ষস্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা কি কুখ্যাত অপরাধীদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা শুরু করেছেন? এসব ঘটনার অগ্রগতির বিষয়ে রাস্তার পাশের আলোচনাই আপনাকে তথ্য দেবে এবং এসব কাহিনির অনেকগুলো সত্যও হতে পারে। কিন্তু সাংবাদিককে এসব ক্ষেত্রে নিজের কাছেই প্রশ্ন করতে হবে: মানুষ কেন এগুলো বিশ্বাস করছে এবং এই প্রবণতা বর্তমান সময় বা দেশ সম্পর্কে আসলে কী বলছে।

প্রথম পদক্ষেপে এসব গুজবের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যাঁদের বিষয়টি জানার কথা, সেই সূত্রগুলো থেকে সব সময় যাচাই করতে হবে। তারপর, যতটা পারা যায় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য নিতে হবে। যেমন: নিখোঁজ মেয়েটির খবর নিশ্চিত করতে স্থানীয় থানায় খোঁজ নিতে হবে। অ্যালকোহল অপব্যবহারের বিষয় হলে চিকিৎসকেরা তা জানবেন। ব্যবসায়ীর বিষয়ে খবর নিতে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কীভাবে চলছে, সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছে খোঁজ করতে হবে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকেরা জানবেন বাজারের প্রবণতার কথা। যখন কোনো গুজবের কিছু ভিত্তি মিলবে, তখন সেটা ধরেই প্রতিবেদনের পরিকল্পনা শুরু হতে পারে।

গোপন সূত্রের তথ্য মূল্যায়ন

অপরাধ ও অনাচার ফাঁস করা অনেক প্রতিবেদনেরই সূচনা হয় গোপন সোর্স বা সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য থেকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পুলিশ বিভাগে আপনার একটি সূত্র গাড়ি চোর চক্রের সঙ্গে একজন কমিশনারের জড়িত থাকার কথা জানেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ এক নারী পত্রিকা অফিসে ফোন করে তাঁর সাবেক স্বামীর আয়কর ফাঁকির তথ্য জানাতে পারেন। আবার সরকারি চুক্তি পেতে একটি কোম্পানির সঙ্গে সরকারি দরপত্র বোর্ডের একজন সদস্যের অন্যায় সম্পর্কের কথা বন্ধুর মতো সম্পাদককে কথাচ্ছলে জানাতে পারেন একজন রাজনীতিবিদ।

কিন্তু এসব তথ্য যেমনটি ধারণা করা হয়, তেমন না-ও হতে পারে। এমনকি অসত্য বা কাউকে ফাঁসানোর জন্য সাজানোও হতে পারে। এগুলো আংশিক সত্য হতে পারে, যাতে করে অন্য কারও উদ্দেশ্য (এজেন্ডা) হাসিল হয়। এসব অভিযোগ সত্য হোক বা না হোক, এগুলো ব্যবহার করে আপনাকে দিয়ে একটা প্রতিবেদন করানোর চেষ্টাও হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যে কাজ অবশ্যই করতে হবে তা হলো, আপনাকে যে গোপন তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেটি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্য নিয়ে কাজ করার সময় প্রথমে যেসব প্রশ্ন করা উচিত:

- গোপন সূত্র থেকে তথ্য না পেলেও কি আমি বিষয়টি নিয়ে লিখতাম?
- বিষয়টা কি এমন, যা সম্পর্কে আমার আগ্রহ রয়েছে?
- যে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কি সত্যিই কোনো জনস্বার্থ আছে?

এই তিনটি প্রশ্নের ক্ষেত্রেই আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে আপনি কাজ শুরু করতে পারেন।

দুর্নীতি: মুদ্রার দুই পিঠের মতো বিষয়

দরপত্র বোর্ডের সদস্যের দুর্নীতি কিংবা সাবেক স্বামী/স্ত্রীর কর ফাঁকির ঘটনাগুলোতে এসব প্রশ্নে আপনার উত্তর কী হবে। আরও একজন দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির ঘটনা প্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনস্বার্থের ওপর তেমন কোনো বড় প্রভাব না-ও পড়তে পারে। যেসব দেশে দুর্নীতি ও কর ফাঁকি রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পদ্ধতিগত অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কিছু সামাজিক গোষ্ঠীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, সেখানে এ ধরনের তথ্য কোনো বড় প্রভাব ফেলার কথা নয়। সাংবাদিকেরা প্রায়ই যুক্তি দেন যে, এ রকম দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হলে অন্যরা ভয় পাবে এবং দুর্নীতিবিরোধী লড়াই কিছুটা এগোবে। এর কিছুটা সত্যতা আছে। দুর্নীতির খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকির কারণে সম্ভাব্য কিছু অসাধু, দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী ও ব্যক্তি হয়তো নিবৃত্ত হবেন এবং অল্প কিছু অর্থও হয়তো রক্ষা পাবে। যেহেতু এসব অর্থ করদাতাদের, তাই সাধারণ মানুষের বিষয়টি জানারও অধিকার রয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে, অসংখ্য দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির তথ্য সংবাদমাধ্যমে প্রকাশে পদ্ধতিগত দুর্নীতিতে তেমন একটা প্রভাব পড়ে না। কারণ, রাষ্ট্রের সব কাঠামো ও লেনদেন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ঢুকে গেছে। এমনকি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, সেখানেও দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। ফলে মানুষ হয়তো এসব প্রতিবেদন দেখবে আর ভাববে, 'এ আর নতুন কি।'

কিন্তু সাংবাদিকেরা যদি এমন পদ্ধতিগত ত্রুটি তুলে ধরতে পারেন, যার কারণে কর ফাঁকি ও ঘুষ গ্রহণ সহজ হয়ে গেছে, তাহলে প্রতিবেদনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে, এবং তাতে হয়তো ঘটনার সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলোর জন্য নিজেদের লুকানো আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

খবরের সন্ধানে

কীভাবে সূত্রের তথ্য, গুজব ও প্রকৃত ঘটনা যাচাই করতে হয়

শুরু করুন আপনার সূত্রের প্রাথমিক তথ্য মূল্যায়ন দিয়ে। যেমন, কারও কাছ থেকে কোনো খবর পেলে বা কোনো ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নাম-ঠিকানাহীন খোলা চিঠি থেকে তথ্য পেলে, আপনার অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে, এটি কে লিখেছে। তার বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কি না, উদ্দেশ্য কী। কারণ, যে কেউ যেকোনো বিষয় ইন্টারনেটে প্রকাশ করতে পারেন। এখানে সত্যিকারের বিশেষজ্ঞ যেমন থাকতে পারেন, তেমনি ষড়যন্ত্রতাত্ত্বিক থেকে শুরু করে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের লবিস্টও।

আপনি যদি ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করে ফেলতে পারেন, তাহলে আপনাকে নামতে হবে তাঁর বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে। সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যতটা পারা যায় পড়ে ফেলতে হবে। তাঁর জীবনকাহিনি জানার চেষ্টা করতে হবে: কোথায় তিনি পড়াশোনা করেছেন, তাঁর কী কী ডিগ্রি আছে। প্রয়োজনে তাঁদের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ও টুইটগুলো পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনো নতুন উদ্যোগের কথা জানা গেলে এর পেছনে প্রধান প্রধান উদ্যোক্তা কারা, তা অনুসন্ধান করতে হবে। তাঁদের সহকর্মী, প্রতিপক্ষ ও সরকারের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্রের বিষয়টি বারবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। একজন নতুন কৃষিমন্ত্রী যদি শস্যবাণিজ্যে নিয়োজিত একটি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানির বোর্ডে থাকেন, তখন এটা বৈধ কি না, তা যাচাই করতে হবে। এমনকি এই রকম পদে থাকা বৈধ হলেও স্বার্থের সংঘাতের বিষয়টি কি উল্লেখ করা হয়েছে—এই ধরনের বিষয়গুলো জানতে পারলে শুধু সোর্সের দেওয়া তথ্য মূল্যায়নও যেমন সহজ হবে, তেমনি আপনার প্রতিবেদনের জন্যও প্রয়োজনীয় অনেক ধারণা পাবেন।

সেই ব্যক্তির সঙ্গে কাজ করেছেন, এমন মানুষদের সঙ্গে কথা বলুন। তাঁরা সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কী বলছেন? আপনার ধারণার সঙ্গে তাঁদের কথা যদি না মেলে, তাহলে কী হবে? আপনি হয়তো ভুল পথে চলে যাবেন। সেই ব্যক্তির 'ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনের' ব্যাপারেও সতর্ক থাকুন। তাঁদের সব কথা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস করবেন না।

জ্বালানি, জমি কিংবা বৃত্তির মতো কোনো কিছুর অপ্রতুলতা নিয়ে প্রতিবেদন পড়ার সময়ও কিছু প্রশ্ন মাথায় আসার কথা: এগুলো কারা নিয়ন্ত্রণ করেন, কীভাবে বন্টন কার্যক্রম পরিচালিত হয়– এসব প্রশ্ন তোলার মাধ্যমে সম্ভাব্য কোনো দুর্নীতি শনাক্ত করা সম্ভব হতে পারে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা এখান থেকে ধারণা পেতে পারেন যে, ওই ব্যক্তিরা কতটা সত্য উন্মোচন করেছেন এবং কতটা লুকিয়েছেন।

অভিযোগের পক্ষে যেসব তথ্যপ্রমাণ হাজির করা হচ্ছে, সেগুলোর যথার্থতা নিয়েও আপনার প্রশ্ন তোলা উচিত। মিথ্যা বা খণ্ডিত কোনো অভিযোগের জন্য 'প্রমাণ' হাজির করা এখন খুবই সহজ। অফিশিয়াল লেটারহেড (বা ফটোশপ), কম্পিউটার ও ফটোকপিয়ার থাকলেই এখন এসব প্রমাণ তৈরি করে ফেলা যায়। এমনকি তাঁদের নথিপত্র আসল হলেও দেখা যাবে, আপনাকে শুধু বেছে বেছে অল্প কিছু নথি দেওয়া হয়েছে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নথি বাদ রাখা হয়েছে; যাতে পরে বলা যায়, আপনার প্রতিবেদন খণ্ডিত বা অর্ধসত্য।

কখনো কখনো তথ্যগুলো এতটাই জটিল বা টেকনিক্যাল হতে পারে যে, বিশেষজ্ঞ নন এমন সাংবাদিকের পক্ষে তা বুঝে ওঠা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, এবং অন্য কারও বিশেষজ্ঞ-জ্ঞানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এ রকম তথ্য নিয়ে আলোচনার জন্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে। সেই বিশেষজ্ঞ হতে পারেন হিসাবরক্ষক, আইনজীবী বা চিকিৎসক। আবার এমনকি দেখতে সাদামাটা মনে হলেও কোনো কোনো নথিতে অপব্যাখ্যার ঝুঁকি থাকে। মাঝেমধ্যে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হওয়ার পরও দেখা যেতে পারে, অসদাচরণ অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ। দুর্নীতির অভিযোগ যখন মশা-মাছির মতো উড়ে বেড়ায়, তখন সাংবাদিকদের খুবই সতর্ক থাকতে হয়, যেন তাঁরা তথ্যদাতার নিজস্ব এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহৃত না হন।

আভাস-ইঙ্গিত, গুজব ও গোপন সূত্রের তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর আপনি চাইবেন যত দ্রুত সম্ভব অনুসন্ধানে নেমে পড়তে। কিন্তু অনুসন্ধান শুরুর আগে আপনাকে পরিকল্পনা করে নিতে হবে, আপনি কীভাবে এগোবেন। প্রথম পদক্ষেপগুলো কী হবে এবং অনুসন্ধানের আগে ও অনুসন্ধানের সময় কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

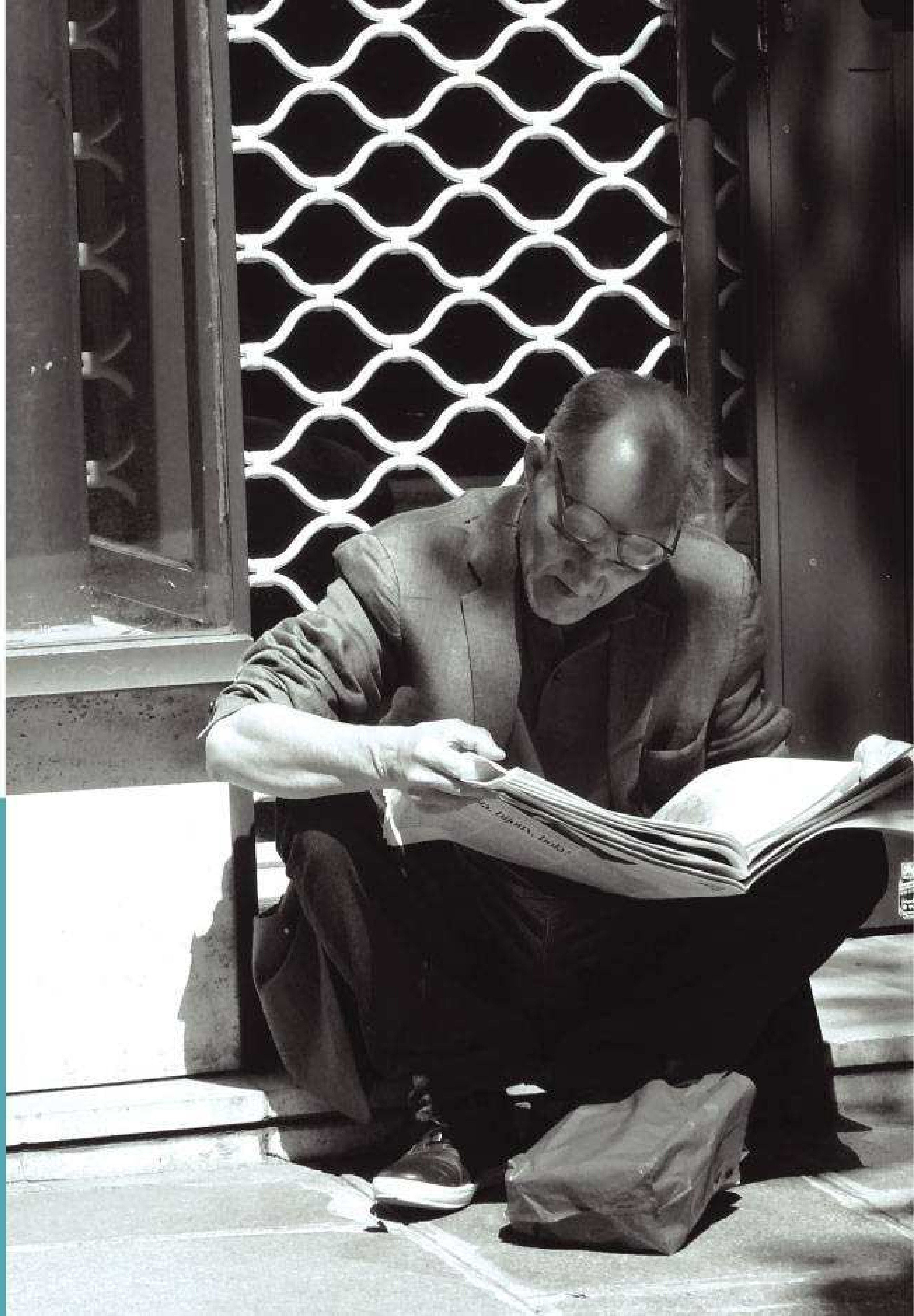

৩

অধ্যায় ৩

পরিকল্পনা তৈরি

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে গেলে চাই সঠিক পরিকল্পনা। এই অধ্যায় আপনাকে সেই পরিকল্পনার বিভিন্ন ধাপ বা পর্যায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। অনুসন্ধান শুরুর আগে নিজেকে কোন কোন প্রশ্ন করতে হবে, সূত্র যাচাই করবেন কীভাবে, বার্তাকক্ষের কাছে নিজের প্রতিবেদনকে প্রস্তাব করার পদ্ধতি এবং এটি করতে যত টাকা খরচ হবে, তার বাজেট তৈরির উপায় কী– এমন একেকটি উদাহরণের মাধ্যমে এই অধ্যায় আপনাকে জানিয়ে দেবে, অনুসন্ধানের জন্য পরিকল্পনা কতটা জরুরি। আরও জানা যাবে, নির্ভরযোগ্য সোর্স কীভাবে চিনবেন এবং প্রমাণনির্ভর প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপনার গল্পের বর্ণনাকে কীভাবে আকর্ষণীয় করে তুলবেন।

আপনি একটি আইডিয়া বা ধারণা পেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই অনুসন্ধানে নেমে পড়লেন—বিষয়টি এমন নয়। আইডিয়া বা ধারণা শুরু করার একটা জায়গামাত্র। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর সামাজিক দায়; আছে নানা ধরনের আইনি ঝুঁকি। এ কারণে আপনাকেই নিশ্চিত করতে হবে প্রতিবেদনটি যেন যথাসম্ভব সঠিক, পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ হয়। গণমাধ্যমে কাজ হয় দলীয় প্রচেষ্টায়, সম্পদও লাগে বেশি। তাই মাঠে নামার আগেই সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ এবং অনুসন্ধানের জন্য আপনার যে ধরনের উপকরণ লাগবে, তার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। আর গল্পের প্রতিটি ধাপ কীভাবে এগোবে, তা আগেই সতর্কভাবে পরিকল্পনা করতে হবে।

অনুসন্ধানের ধারণা কোন উৎস থেকে এসেছে, সেটি আপনার কর্মপরিকল্পনা সাজানোর একটি নিয়ামক। সেই ধারণা যদি আপনার নিজের পর্যবেক্ষণ বা একটিমাত্র ঘটনা থেকে আসে, তাহলে আগে নিশ্চিত হতে হবে, এই অভিজ্ঞতা কি নিছক ব্যক্তিপর্যায়ের, নাকি তা বৃহত্তর কোনো প্রবণতা বা ইস্যুকে তুলে ধরে। যদি এই ধারণা কোনো গোপন সূত্র থেকে আসে, তাহলে আপনাকে তার যথার্থতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং তথ্যদাতার অভিপ্রায় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। সবই করতে হবে কাজ শুরুর আগে। যদি আপনার সূত্র নিখুঁত হয় এবং প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণ যদি অকাট্য হয়; তারপরও এই প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে আপনার আইডিয়াকে একটি শক্ত অনুমান বা হাইপোথিসিসের ওপর দাঁড় করাতে হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, আপনার অনুসন্ধান যার উত্তর খুঁজবে, অথবা যাকে সত্য বা মিথ্য বলে প্রমাণ করবে, সেই প্রশ্নটি আগে ঠিক করে নিতে হবে। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ের এই পরিকল্পনা যে একেবারে অপরিবর্তনীয়, তা নয়। এতে পর্যাপ্ত নমনীয়তা থাকতে হবে, যাতে আপনার অনুসন্ধানে নতুন তথ্য বা দিক পাওয়া গেলে তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়।

প্রায়ই দেখা যায়, অনুসন্ধান শুরু হয় বিস্তৃত একটি ধারণা নিয়ে, ফলে বড় পরিসরে তার সঙ্গে জড়িত মোটামুটি সব বিষয় খতিয়ে দেখার (এবং সম্ভবত অনিয়ন্ত্রণযোগ্য) পরিস্থিতি তৈরি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা আটলান্টা জার্নাল-কনস্টিটিউশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এবং স্বনামধন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদক টমাস অলিভার বলেছেন: 'অনেক সময় একটি বিষয়ে আপনি যা যা জানতে চান, তার সম্ভাব্য সবকিছু অনুসন্ধানী প্রকল্পের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলার ঝোঁক দেখা যায়। এটা একটা দুর্বলতা, শক্তি নয়।'

আপনার ধারণাকে এগিয়ে নেওয়া ও উন্নত করার একটা ভালো কৌশল হলো বিষয়টি নিয়ে লিখতে শুরু করা। প্রতিবেদনের একটি সারসংক্ষেপ তৈরির চেষ্টা করুন, চূড়ান্ত প্রতিবেদন কেমন হবে, তা নিয়ে একটি প্যারাগ্রাফ লিখে ফেলুন। এভাবে বার্তাকক্ষকে আপনার প্রতিবেদন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া যাবে এবং সম্ভাব্য সব ব্যাখ্যাও দাঁড় করানো সম্ভব হবে। এর মাধ্যমেই আপনি বুঝতে পারবেন, প্রতিবেদনটি স্থানীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড় করাবেন, নাকি তার আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে প্রভাব ফেলার মতো ক্ষমতা আছে। এই পর্যায়ে নিচের প্রশ্নগুলো আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে:

- কী ঘটছে। কেন আপনার পাঠক বিষয়টিতে আগ্রহী হবে?
- এর সঙ্গে কারা জড়িত। কীভাবে তারা এটা করেছে। এর ফল কী হয়েছে?

- কী ভুল/অনিয়ম হয়েছে। কীভাবে এই ভুল/অনিয়ম হয়েছে। এর পরিণতি কী।
- খবরটি প্রকাশিত হলে কারা সুবিধা পাবেন এবং কারা সমস্যায় পড়বেন। খবরটি প্রকাশ পেলে সমাজের আচরণ বা মূল্যবোধ নিয়ে কি কোনো বিতর্ক হবে। বিশেষ এই খবরটিতে কী পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ত্রুটির বিষয়টি উঠে আসবে।

কীভাবে প্রতিবেদন লিখবেন, তা ভাবতে এবং কীভাবে অনুসন্ধান করবেন, তার পথ শনাক্ত করতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনাকে সাহায্য করবে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পানি সরবরাহ সেবা বেসরকারীকরণ করার পর কোনো এলাকায় ডায়রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে, এমন একটি প্রতিবেদনের কথা। আপনি প্রতিবেদন করতে পারেন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বেশি দামে কিনতে না পেরে মানুষ কীভাবে, কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করছে (এখানে প্রধান কথা হলো ক্রয়ক্ষমতা)। কিংবা আপনি শোধনাগার পরিদর্শন করে পানি নিরাপদ করার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবেদন করতে পারেন (এখানে প্রধান কথা হলো খরচ কমাতে গিয়ে মাননিয়ন্ত্রণে ঘাটতি)। সতর্কভাবে এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে প্রতিবেদনের মূল বার্তা চিহ্নিত করা সহজ হয়।

এই সময়ে আপনি আরও দেখবেন: প্রতিবেদনটি সত্যিই জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কি না এবং বিভ্রান্তিকর হতে পারে এমন যেকোনো ধারণা বাদ দিতে হবে। দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করবেন না, যাতে কেউ প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আপনি যখন আপনার প্রয়োজনীয় সব তথ্যপ্রমাণ পেয়ে যাবেন, তখন এই প্রশ্নগুলোতে ফিরে গিয়ে আপনি আপনার লেখাকে সাজাতে পারবেন।

ধারণা থেকে অনুমান

এবার আপনাকে প্রাথমিক ভাবনা থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের দিকে যেতে হবে, যেগুলোর উত্তর আপনার প্রতিবেদনে থাকবে। এটি আপনাকে সাহায্য করবে:

- প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রমাণগুলো কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে
- উদ্দেশ্য ও সীমানা নির্ধারণ করে দিয়ে আপনার কাজটাকে আরও সহজ করতে
- প্রতিবেদনের এই ধারণা অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে ও তুলে ধরতে
- প্রতিবেদনের জন্য দরকারি সময়, সরঞ্জাম ও সম্পদ (খরচ)-এর বাজেট তৈরিতে
- চূড়ান্ত প্রতিবেদন লেখার ভিত্তি ও গাঁথুনি নির্ধারণে

একটি ধারণা থেকে একাধিক অনুমান দাঁড় করানো যায় কিংবা চূড়ান্ত প্রতিবেদনের দিকনির্দেশনা তৈরি করা যায়। যেমন: আপনার ধারণা হলো, পানি সরবরাহ সেবা বেসরকারীকরণের পর দরিদ্রদের মধ্যে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়েছে। এখান থেকে দুটি অনুমান করতে পারেন:

(ক) পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণের ফলে দাম বেড়ে যাওয়ায় গরিবেরা তা কিনতে পারে না; তাই তারা বিনা পয়সায় অস্বাস্থ্যকর উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করছে, যার পরিণতি হচ্ছে মহামারি।

(খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি খরচ কমাতে পানি বিশুদ্ধকরণ ও সরবরাহে মাননিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব না দেওয়ায় পানির বিশুদ্ধতা কমে যাচ্ছে, যে কারণে রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।

কিন্তু আপনাকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন করতে হবে– এই অনুমানের ভিত্তি কী এবং তা কতটা ন্যায্য। দুই ক্ষেত্রেই রোগের উৎস বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া শুধু অনুমানের ভিত্তিতে। অনুমান ‘ক’-তে বিনা পয়সার অন্যান্য উৎস থেকে সংগৃহীত পানিকে দায়ী করা হয়েছে; এবং অনুমান ‘খ’-তে পানির প্ল্যান্টগুলো বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করার ব্যাপারে উদাসীনতাকেই দায়ী বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। সম্ভাব্য এই দুই অনুমানই আপনাকে খতিয়ে দেখতে হবে। কারণ, দুটোরই ভিত্তি অনেক গভীরে— অর্থাৎ রোগের শুরু যেখান থেকে।

আরও ভালো অনুমান হতে পারে:

(গ) সম্প্রতি ‘এক্স’ পৌর এলাকায় পানিবাহিত রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়ার জন্য দায়ী– হয় বেসরকারি পানি সরবরাহকারীরা কিংবা বিনা পয়সার উৎস থেকে পাওয়া পানি।

এই পরিমার্জিত উপসংহার আপনাকে প্রতিবেদনের রূপরেখায় নিয়ে যাবে এবং সুস্পষ্ট ও ভারসাম্যপূর্ণ অনুসন্ধানের পথ দেখাবে।

(ঘ) ‘এক্স’ পৌর এলাকায় সম্প্রতি একটি পানিবাহিত রোগ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে খোঁজা হবে মহামারি কীভাবে শুরু হলো। এর কারণে কি বেসরকারি কোম্পানির পানির দাম মানুষের সামর্থ্যের বাইরে বলে তারা বিনা পয়সায় কূপ বা উন্মুক্ত জলাশয় থেকে দূষিত পানি সংগ্রহ করছে? নাকি, খরচ কমাতে গিয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটি পানি বিশুদ্ধকরণের মান কমিয়ে দিয়েছে– এই কারণে? আমরা এই মহামারির উৎস জানতে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলব। অভাবী মানুষ বিনা পয়সার পানির জন্য প্রতিদিন কোন উৎসগুলোতে যায়, তা অনুসন্ধান করব। এবং স্বাধীন বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞকে নিয়ে পরিশোধনকেন্দ্রের নিরাপত্তার মান যাচাই করব। এভাবে যখন এই মহামারি ছড়িয়ে পড়ার কারণ শনাক্ত করা যাবে, তখন তা ঠেকাতে কী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তা-ও খতিয়ে দেখা যাবে।
প্রতিবেদনের জন্য আপনি যখন সুস্পষ্টভাবে একটি ব্যাখ্যা বা অনুমান দাঁড় করাতে পারবেন, তখন আপনার এই বিষয়গুলোসহ গবেষণার পরিকল্পনা করতে হবে:

- তথ্যের জন্য সূত্র বের করা
- কী ধরনের প্রমাণ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা
- কোন পদ্ধতিতে কাজ করবেন তা নির্ধারণ
- টাইমলাইন তৈরি এবং
- বাজেট প্রণয়ন

এই ধাপগুলোর পরিকল্পনা কীভাবে হবে, তার একটা সাধারণ ধারণা এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে তুলে ধরা হয়েছে। আর পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তুলে ধরা হবে এই ধাপগুলো কার্যকর করার বিস্তারিত বর্ণনা। এবং শেষ পর্যায়ে প্রতিবেদনটি সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দেওয়ার জন্য আপনাকে দিতে হবে একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম। শেষ পর্যন্ত হয়তো এই শিরোনাম আপনি বদলেও দিতে পারেন। কিন্তু শুরুতে একটি শিরোনাম সামনে রেখে কাজ করলে সেটি আপনার প্রতিবেদনে মনোযোগ ধরে রাখতে সাহায্য করবে। এতে করে আপনার জন্য প্রতিবেদনটি 'পিচ' বা প্রস্তাব করা যেমন সহজ হবে, তেমনি গল্পটি সৃজনশীলতার সঙ্গে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, সেই চিন্তাতেও সাহায্য করবে। অবশ্যই যখন প্রয়োজন পড়বে, তখন আপনি এটি এদিক-সেদিক করে নিতে পারবেন।

সূত্র

সোর্স ম্যাপিং: অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে, আপনার প্রতিবেদনের প্রধান চরিত্রগুলোকে শনাক্ত করা এবং তাদের কর্মকাণ্ড নথিবদ্ধ করা। অনেক প্রকাশ্য রেকর্ডেই সরকার, হাসপাতালের কর্মী, করপোরেশন, মাফিয়া চক্র বা দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। আপনার অনুমান সঠিক কি না, তা যাচাইয়ে অনেক সূত্রই আপনার সহায়ক হতে পারে এবং সেগুলো আপনার অনুমানের সত্য-মিথ্যা নিশ্চিত করতে পারে। প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য যাচাইয়ের জন্য অবশ্যই দুই-সূত্র নীতি অবলম্বন করবেন। তার মানে, আপনি একই তথ্য দুটি নিরপেক্ষ সূত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত হচ্ছেন। এই সূত্রগুলো আপনাকে 'ব্যাকগ্রাউন্ড এক্সপার্ট' বা পটভূমির বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ জোগাবে। আপনার নোটবুকে সূত্রগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা টুকে রাখতে ভুলবেন না।

সূত্র বা সোর্স মূলত দুই ধরনের: প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি।

১ প্রাইমারি সোর্স

এরা আপনাকে একদম প্রত্যক্ষ তথ্যপ্রমাণ দেবে বা সরাসরি কোনো অভিজ্ঞতার কথা বলবে। যেমন, কোনো রোগী যদি কোনো নার্সের মাধ্যমে হাসপাতালের বাইরে থেকে ওষুধ কেনেন, তাহলে তিনি ওষুধের কালোবাজার সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেন। অবশ্য নার্সরা দৃশ্যের আড়ালে কী কী কর্মকাণ্ড করেন, সে ব্যাপারে হয়তো আপনাকে বিস্তারিত বলবেন না। কোনো পানি বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্টের জমাদার, যাঁকে হয়তো প্রতি সপ্তাহের বদলে মাসে একবার পানির বিশুদ্ধতা যাচাই করতে বলা হয়েছে, তিনিও হতে পারেন আপনার প্রাইমারি (প্রাথমিক) সোর্স। কোনো মন্ত্রীর ব্যাংক হিসাব বিবরণীও একটি প্রাইমারি সোর্স। সেখানে হয়তো আন্তর্জাতিক কোনো আগ্নেয়াস্ত্র কোম্পানির কাছ থেকে অর্থ পাওয়ার কথা লেখা আছে। সত্যতা ও নির্ভুলতা যাচাই করে নিতে পারলে এসব প্রাইমারি সোর্স থেকেই আপনি পাবেন সবচেয়ে কার্যকর প্রমাণ। তবে এসব খুঁজে পাওয়া প্রায়ই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কোনো ঘটনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত, এমন অনেকেই হয়তো ভবিষ্যতের হয়রানি বা ঝামেলার কথা ভেবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চান না। অন্যদিকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা হাসপাতালের নথিপত্রের মতো বিষয়গুলো গোপন রাখা হয়, অথবা গোপনীয়তা আইনের কারণে সহজে পাওয়া যায় না।

পরিকল্পনা তৈরি

২ সেকেন্ডারি সোর্স

এই ক্যাটাগরির মধ্যে থাকবে সব ধরনের নথি: যেমন, সংগঠনের নানা রকম প্রতিবেদন; বা এমন কোনো ব্যক্তি, যিনি ঘটনা নিজে দেখেননি কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী থেকে শোনা বিবরণ আপনাকে বলছেন ('আমার এক বন্ধু, যে...')। সেকেন্ডারি সোর্সও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে কোনো ঘটনার প্রেক্ষাপট ও প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো জানা-বোঝার জন্য। এখান থেকে আপনি অন্য কোনো সূত্রও পেয়ে যেতে পারেন। তবে সেকেন্ডারি সোর্স থেকে পাওয়া যেকোনো তথ্য খুব ভালোমতো যাচাই করে নিতে হয়।

সোর্সকে আপনি আরও চার ভাগে বিভক্ত করতে পারেন: ব্যক্তি, নথি, ডিজিটাল ও গণ (ক্রাউডসোর্স)।

(ক) ব্যক্তিসূত্র

অনেক সূত্রই এই শ্রেণিতে পড়েন: যাঁরা সরাসরি জড়িত, প্রত্যক্ষদর্শী, বিশেষজ্ঞ এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট; এ বিষয়ে আগ্রহী ও অনিচ্ছুক। আপনি যাঁর কাছে তথ্যের জন্য যাবেন, তাঁর অবস্থান, বিশ্বাসযোগ্যতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। আপনি যদি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ নিয়ে প্রতিবেদন করেন, তাহলে বেসরকারীকরণের বিরোধিতাকারী সংগঠন, সংস্থা বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা আপনাকে বিরোধিতার কারণ নিয়ে প্রচুর তথ্য ও জোরালো যুক্তি বা মতামত দিতে পারবেন। কিন্তু এই তথ্য আসছে নির্দিষ্ট অবস্থানের ব্যক্তিদের কাছ থেকে, সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে, যাঁরা একটি বড় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। সে ক্ষেত্রে যিনি বা যাঁরা সারাংশ হিসেবে তথ্য সরবরাহ করতে পারেন, তিনি বা তাঁরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে ওই গোষ্ঠীর মতামত পরিবর্তন করে বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো পয়েন্ট বাদ দিয়ে তা আপনার কাছে তুলে ধরতে পারেন। তাই আপনাকে বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও সূত্র থেকে তথ্য নিতে হবে। আপনি কোনো জনগোষ্ঠীর মতামত নিতে গেলে আপনাকে বিবেচনা করতে হবে, তা যেন পুরো জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন নারী, পুরুষ, তরুণ, বৃদ্ধ, উচ্চ ও নিম্ন আয়ের কিংবা স্বার্থসংশ্লিষ্টতার ভিন্নতার দিকগুলোও বিবেচনায় নেওয়া। ব্যক্তিসূত্র আপনার প্রতিবেদনের সত্যতা নিশ্চিত করে এবং খবরকে জীবন্ত করে তোলে।

(খ) নথিসূত্র

এই সূত্র হতে পারে বই, সংবাদপত্র ও সাময়িকী, সরকারি দলিল এবং ব্যবসায়িক দলিল, যেমন: চুক্তিপত্র বা ব্যাংক বিবরণী। এটা হতে পারে এমন তথ্য, যা গবেষণায় বেরিয়ে এলেও ('গ্রে' বিষয়বস্তু) প্রতিবেদন হিসেবে প্রকাশিত হয়নি (যেমন: বেসরকারি সংস্থার পরিচালিত গবেষণা, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট গবেষণা), অথবা যা সরকারিভাবে বা আনুষ্ঠানিকভাবে গোপন রাখা হয়েছে। তবে নথিপত্র খোঁজার (পেপার ট্রেইল) কিছু চ্যালেঞ্জও আছে: কখনো কখনো আমরা জানতেই পারি না যে প্রমাণ সত্যি আছে নাকি নেই। নথি থাকলেও সেটি খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে দুর্বল নথি ব্যবস্থাপনার কারণে; কোথাও কোথাও তথ্য অধিকার আইন নেই বলে আবেদন করেও সেটি পাওয়ার সুযোগ থাকে না; আবার তথ্যটি প্রকাশিত হলে প্রতিষ্ঠান বা সরকার সমস্যায় পড়বে ভেবে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নথি পাওয়ার পথে বাধাও সৃষ্টি করতে পারেন। তাই আপনি যে বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন, সে বিষয়ে কোথায় কী নথি থাকতে পারে, সেসব নথি কোথায় কীভাবে রাখা হয়েছে এবং কীভাবে এই নথিগুলো পাওয়া যেতে পারে—এগুলো খুঁজে বের করা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রাথমিক গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। নথি পাওয়ার জন্য যদি কোনো কর্মকর্তার আগাম অনুমতি প্রয়োজন হয়, তাহলে গবেষণা শুরুর পর্যায়ে যত দ্রুত সম্ভব এই আবেদন করতে হবে। কারণ, কর্মকর্তার অনুমতির পরও নথি পেতে কয়েক সপ্তাহ বা মাস লেগে যেতে পারে।

(গ) ডিজিটাল সূত্র

ডিজিটাল সূত্র হলো যে তথ্যগুলো ওয়েবে এবং ডিজিটালি সংরক্ষিত রেকর্ডস থেকে পাওয়া যায়। অনলাইনে যে বিপুল পরিমাণে তথ্য পাওয়া যায়, তা বিস্ময়কর। তবে অন্য সূত্রের মতোই এসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। আপনাকে যাচাই করে নিতে হবে তারা নিজেদের বিষয়ে কী লিখেছে এবং পরিবার ও বন্ধুরা তাদের কীভাবে তুলে ধরছে। মনে রাখতে হবে, ওয়েব প্রায় নিয়ন্ত্রণহীন। যে কেউ যেকোনো বিষয় ওয়েবের বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করতে পারে, যার মধ্যে পুরোপুরি বিকৃত তথ্যও থাকতে পারে। এ ছাড়া অনলাইনে একই তথ্য অনেক দিন ধরে একই অবস্থায় থাকতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে, কিছুদিন পর সে তথ্যগুলো তামাদি হয়ে যায়। প্রথমে আপনাকে অবশ্যই সবচেয়ে হালনাগাদ তথ্য খুঁজতে হবে। আরও সাহায্যের জন্য আপনি ইউরোপিয়ান জার্নালিজম সেন্টারের (ইজেসি) ভেরিফিকেশন হ্যান্ডবুকের কপি বিনা মূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এতে কিছু টুল রয়েছে, যা আপনাকে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের পদক্ষেপগুলো বিস্তারিতভাবে নির্দেশ করবে।

(ঘ) গণসূত্র

ক্রাউডসোর্স নামে বহুল পরিচিত নতুন এই টুল ব্যক্তি ও ডিজিটাল সূত্রের মিশেল ঘটায়। এতে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য পাঠক-দর্শককেও অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। যেমন, টুইটারে তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা বা কোনো ফেসবুক লাইভ ভিডিওতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা।

সূত্রের ধরন	কেন দরকার	শক্তি	সম্ভাব্য সমস্যা
ব্যক্তি	প্রতিবেদনে প্রাণসঞ্চার করে এবং সত্যতা নিশ্চিত করে	সাক্ষাৎকারের জন্য উচ্চতর প্রযুক্তির প্রয়োজন হয় না সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতা প্রতিবেদনকে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে	ব্যক্তির পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে, তিনি অনুমান থেকে বলতে পারেন, এমনকি মিথ্যাও বলতে পারেন। প্রমাণ পাওয়া যায় না এমন তথ্য দিতে পারেন (সূত্রের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করুন) গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার জন্য তথ্যদাতা নিপীড়নের শিকার হতে পারেন (কীভাবে তাঁকে সুরক্ষা দেওয়া যায়, তা ভাবতে হবে)
নথি	শক্ত প্রমাণ দেয় ইতিহাস ও প্রেক্ষাপট মেলে	সেকেন্ডারি সূত্র থেকে আপনি যতটা প্রেক্ষাপট পাবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য জোগাবে প্রাথমিক সূত্র হিসাবে যেমন (ব্যাংক রেকর্ড) নথিবদ্ধ এবং অকাট্য প্রমাণ	সেন্সরশিপ বা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আইনের বাধা থাকতে পারে। তথ্য পাওয়া তাই সময়সাপেক্ষ বা কঠিন হতে পারে তথ্যগুলো বুঝতে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান প্রয়োজন হতে পারে মৃত ব্যক্তির বক্তব্য বা তত্ত্বনির্ভর (একাডেমিক) প্রতিবেদন হতে পারে, যাতে জীবিত কারও কথা না থাকায় সেটা প্রাণবন্ত না-ও হতে পারে
ডিজিটাল	কী জোগাড় করা গেল, তার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু ওপরের সবকিছু হতে পারে	সবকিছুই আপনার কম্পিউটারের মাধ্যমে করা যায়, যুক্ত করতে পারেন অডিও-ভিডিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে খুব দ্রুত এবং বিপুল পরিমাণ তথ্য পোস্ট করার সম্ভাবনা থাকায় তা সহজলভ্য	প্রতিবেদনটির বিষয় তামাদি হয়ে গিয়ে থাকতে পারে ইন্টারনেটে তথ্যের নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকতে পারে ইন্টারনেটে থাকা গুজব ও ভুয়া তথ্য যাচাই কঠিন হতে পারে

আপনার অনুসন্ধানের জায়গায় হয়তো তথ্য পাওয়ার জন্য কোনো আইন থাকতে পারে। বিভিন্ন দেশের আইনগুলোর নামে যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি উপাদানের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা রয়েছে। যে কারণে এসব আইনগত বিষয়ে অভিন্ন বৈশ্বিক পরামর্শ দেওয়া কঠিন। তবে অনুসন্ধান শুরুর আগে আপনার দেশের আইন নিয়ে কিছু গবেষণা করে নেওয়া আবশ্যক।

সূত্রের নেটওয়ার্ক তৈরি

প্রতিবেদনের কাজে আপনাকে অনেক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এত কিছুর কথা একসঙ্গে মাথায় রাখার বিষয়টি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে পারে। ফলে সূত্রদের একটি ম্যাপের মাধ্যমে আঁকা যেতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন রঙের তীরচিহ্ন ব্যবহার করে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝানো যেতে পারে। যদি সন্দেহজনক কিছু নজরে আসে: যেমন, কোনো টিম্বার লগিং ফার্মের প্রধানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বন উজাড় করার পক্ষের কোনো রাজনীতিবিদের। এই সম্পর্ক পরবর্তীকালে আরও ভালো করে খতিয়ে দেখতে হবে, তা মাথায় রাখুন। এটি হয়তো ক্লান্তিকর একটি প্রক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু আপনার মনোযোগ ধরে রাখুন আর নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, আপনি সমাজের ওয়াচডগ হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন এবং কণ্ঠহীনদের কথা তুলে আনছেন।

মার্ক হান্টার ও লুক সেঙ্গারস কার্যকরভাবে তথ্য মানচিত্র (ডেটা ম্যাপিং) তৈরির এবং তথ্য গুছিয়ে রাখার কিছু কৌশল তুলে ধরেছেন। সেগুলো হচ্ছে:

- একটি সময়পঞ্জি বা টাইমলাইন তৈরি করুন, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা থাকবে। যেমন: তারিখ, স্থান, সেখানে কে বা কারা ছিলেন, তিনি বা তাঁরা কী বলছেন, কী ঘটেছে। এগুলো এমনভাবে গুছিয়ে রাখুন, যাতে যখনই প্রয়োজন তখনই ব্যবহার করতে পারেন।
- তথ্য পাওয়ার সম্ভাব্য সূত্রগুলোর একটি তালিকা তৈরি করুন এবং (এবং এই তথ্যগুলো নিরাপদে সংরক্ষণ করুন)। কারও সঙ্গে যোগাযোগের পর তালিকাটি হালনাগাদ করুন এবং আরও কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে, তা লিখে রাখুন।
- প্রতিবেদন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যোগসূত্র একটি চিত্রের মতো করে আঁকুন।
- গুরুত্বপূর্ণ নথির তালিকা তৈরি করুন। লিখে রাখুন আপনার কাছে কী আছে এবং আরও কী জোগাড় করতে হবে।
- নথিগুলোর সূচি তৈরি করুন। কম্পিউটারে কাজ করলে অনলাইন সংস্করণের জন্য হাইপারলিংক তৈরি করুন।
- যে তথ্যগুলোর বিষয়ে আপনি নিশ্চিত হয়েছেন, সেগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত (হাইলাইট) করে রাখুন।
- অন্য তথ্যগুলো কী পর্যায়ে রয়েছে, তা লিখে রাখুন।
- নিজের সঙ্গে নোটবুক রাখুন, যখন কিছু মনে হয় বা ভাবনায় আসে, তা লিখে ফেলুন।

পর্যাপ্ত প্রমাণ নিশ্চিত করা

যোগাযোগ করতে হবে, এমন সূত্রের তালিকা করে ফেলার পর আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করতে কিংবা মূল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেতে আপনি কোন কোন সাক্ষ্য-প্রমাণকে আমলে নেবেন। পানি শোধনাগারে আগে যতবার পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা হতো, এখন তার চেয়ে কম করা হচ্ছে, শুধু সেটুকু প্রমাণিত হলেই কি যথেষ্ট হবে, নাকি খুঁজে বের করতে হবে যে গুণগত মান পরীক্ষা কমে যাওয়ার পরিণতি কী হয়েছে? ভালো অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা শুধু নিজের অনুমানের সমর্থনে তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেন না; বরং এর বিপরীতটাও খোঁজেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন সরকারি কর্মকর্তা, যিনি আগে থেকেই ধনী, তিনি কোনো কাজ করে দেওয়ার জন্য ১০ হাজার ডলার ঘুষ নেবেন– এমনটি না হওয়ারই কথা। কাজেই চিন্তা করুন, যে প্রমাণটি পেয়েছেন, সেটি কি সোর্সের মনগড়া (তিনি মনে মনে ভাবছেন এমনই হওয়ার কথা, কিন্তু আসলে তা নয়)? আবারও বলছি, যে প্রমাণ পেয়েছেন তার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করুন: এটি কতটা পূর্ণাঙ্গ, এটি কোথা থেকে এসেছে, ভিন্ন ভিন্ন সূত্র কি এর সত্যতা নিশ্চিত করতে পারবে কি না।

মাথায় রাখুন, কোনো কিছুর চূড়ান্ত বা অকাট্য প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা বিরল। কখনো কখনো আপনি হয়তো শুধু এমন কিছু তথ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারবেন যেটি বলবে: অন্য কিছুর চেয়ে এমনটা ঘটার সম্ভাবনাই বেশি। সবকিছুই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার চূড়ান্ত প্রতিবেদনে এটি স্পষ্ট হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি হয়তো প্রতিবেদনটি করতে পারেন। যদিও এটি পুরোপুরি নিশ্ছিদ্র নয়। তবে কিছু বিষয় আপনি কীভাবে তুলে আনবেন, তা নিয়ে আপনাকে খুবই সতর্ক হতে হবে।

পদ্ধতি

সঠিক সূত্র বা নথি খুঁজে পাওয়াটা সব সময় এত সাদামাটা হয় না।

মেথডোলজি বা পদ্ধতি শব্দটি শুনলেই মনে হতে পারে, বিষয়টি একাডেমিক গবেষণার সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু এর অর্থ আসলে, আপনি কীভাবে আপনার অনুসন্ধান পরিচালনা করবেন, তা নির্ধারণ করা। আপনি হয়তো এমন অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করবেন: নথিপত্র বিশ্লেষণ, সরাসরি সাক্ষাৎকার, স্থান পরিদর্শন। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন সূত্রগুলো ব্যবহার করবেন, প্রতিটির জন্য কতটা সময় ব্যয় করবেন, তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ে (ক্রস চেক) কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন। এই কাজ করতে গিয়ে কী ধরনের বাধা আসতে পারে, সে ব্যাপারে পরিকল্পনা করে নেওয়াও এই প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যেমন প্রতিবেদনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি না-ও পেতে পারেন কিংবা সূত্র হিসেবে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি না-ও হতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনার বিকল্প পরিকল্পনা কী হবে। আপনি কীভাবে বিকল্প প্রমাণ জোগাড় করবেন, যা সমমূল্যের প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে।

কাজের পদ্ধতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে অনুসন্ধানের জন্য একটা সময়সূচি (টাইমলাইন) এবং বাজেট তৈরি করতে হবে। সময়সূচি হলো আপনার অনুসন্ধানে কতটা সময় লাগবে, তার একটি হিসাব: আর্কাইভ, সাক্ষাৎকার, গবেষণা, ওয়েবে অনুসন্ধান এবং প্রতিবেদন লেখায় আপনার কত ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হবে।

নানা কাজের মধ্যে আপনার সময় ব্যয়ের পাশাপাশি সময়সূচি তৈরির আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাজ শেষ করার নির্দিষ্ট সময়সীমা (ডেডলাইন) এবং প্রতিযোগিতা। আপনার প্রতিবেদন যদি ইতিমধ্যে অনুমোদন পেয়ে থাকে, তবে জমা দেওয়ার সময়সীমা থেকে পেছন দিকে হিসাব করে কাজের সূচি ঠিক করুন। সাক্ষাৎকার-গবেষণার সূচি এই সময়কাঠামো মেনেই করতে হবে। অন্যদিকে, যদি প্রতিবেদনের প্রস্তাব আপনি কোনো সম্পাদকের কাছে অনুমোদনের জন্য দিয়ে থাকেন, তাহলে কাজ শুরুর সময় উল্লেখ করুন এবং আপনার প্রতিবেদন কবে নাগাদ প্রস্তুত হবে, তা-ও আপনাকে বলতে হবে। প্রতিবেদনের প্রস্তাব অনুমোদনের আলোচনাও এই প্রক্রিয়ার একটা অংশ। প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সম্পাদকের সঙ্গে আপনার আলোচনার জন্য এই সময়সূচির প্রয়োজন হবে।

তবে আপনার প্রতিবেদন যদি জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বা বহুল আলোচিত কোনো বিষয়ে হয়, তাহলে বিষয়টি নিয়ে অন্য মিডিয়াও কাজ করবে, এমনটাই স্বাভাবিক। এর ফলে প্রতিবেদনটি দ্রুত প্রকাশের একটি বাড়তি তাগিদ তৈরি হয়। তবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে তাড়াহুড়া বা কোনো কিছু এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না, এর ফলে আইনি ঝামেলাও হতে পারে। আপনার সামনে একটি সময়সূচি থাকলে আপনি বুঝতে পারবেন, কোন পর্যায়ে এসে আপনি স্পষ্ট ও যথার্থ কিছু প্রকাশ করতে পারেন; এমনকি অনুসন্ধান পুরোপুরি শেষ না হলেও।

বাজেট

আপনার 'প্রকল্প পরিকল্পনা'র জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাজেট। এই অনুসন্ধান শেষ করতে কত টাকা লাগবে, কী ধরনের সরঞ্জাম দরকার হবে।
এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- ভ্রমণ ব্যয়—যেমন বিমান ভাড়া, গাড়ি খরচ, নিজের এবং সোর্সের থাকা-খাওয়া
- পরামর্শক ফি—যেমন অনুবাদ-নকলনবিশদের সম্মানী
- যোগাযোগ খরচ—যেমন, ফোন ও ইন্টারনেট বিল
- আর্কাইভ বা রেকর্ড খোঁজার ফি, বিভিন্ন নথির নোটারি করা ইত্যাদি

দলগত কাজের ক্ষেত্রে দলের সদস্যদের জন্য কর্মশালা এবং তাঁদের ভ্রমণ ব্যয়ও বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বিশ্বজুড়েই নিউজরুমগুলো সংকুচিত হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির পত্রিকাগুলোতে একেকটি অনুসন্ধানী প্রকল্পে যে পরিমাণ বাজেট থাকে, তা দিয়ে উন্নয়নশীল কোনো দেশের একটি ছোট সংবাদপত্র পুরো বছর চলতে পারে। আপনার প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স যদি সীমিত হয়, তাহলে সহায়তা পাওয়া যাবে এমন উৎস খুঁজে বের করার ব্যাপারে সৃজনশীল হতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটা ভালো সূত্র হতে পারে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলো। দেখা গেল আপনি যে বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন, ঘটনাচক্রে তা কোনো দাতা প্রতিষ্ঠানের অগ্রাধিকারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। তবে দাতারা যাতে তাদের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে না পারে, সেই বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে। আরেকটি সম্ভাব্য ব্যবস্থা হতে পারে গণ-অর্থায়ন (ক্রাউডফান্ডিং), এক কথায় পাঠক-দর্শকের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ। সাধারণ সাংবাদিকতার প্রকল্প বা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য তহবিল সংগ্রহ বেশ জনপ্রিয়, আবার একই সঙ্গে কঠিনও।

> !
> ফেলোশিপ ও ক্রাউডফান্ডিং নিয়ে দেখতে পারেন জিআইজেএনের রিসোর্স:
> http://gijn.org/resources/grants-and-fellowships/
> http://gijn.org/resources/crowdfunding-for-journalists-2/

বেশির ভাগ সাংবাদিকই একমত—তথ্যের জন্য সূত্র বা সোর্সকে টাকা দেওয়া ভালো নয়। কেননা, টাকার লোভে সূত্র মিথ্যা তথ্য দিতে পারেন বা ঘটনা অতিরঞ্জিত করতে পারেন। এর চেয়ে খারাপ যা—টাকা দিয়ে হিতে বিপরীত হয়ে উঠবে, যখন আপনার সোর্স পিছু হটবেন বা পরে যখন তিনি তাঁর বক্তব্য অস্বীকার করবেন। এ ছাড়া টাকা দেওয়ার বিষয়টি আপনার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের নৈতিক মান এবং সাংবাদিকের অনুসন্ধানী দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তৈরি করে।

তবে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, যেমন একজন সূত্র তাঁর কাজের সময় বাদ দিয়ে আপনাকে সাক্ষাৎকার দিলে তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া, কিংবা যাতায়াতের খরচ বা অন্য ব্যয়ের জন্য টাকা দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে যে, কেন টাকা দেওয়া বা নেওয়া হচ্ছে। টাকাও দিতে হবে কম বা 'স্বাভাবিক' হারে। সূত্রকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, তিনি তথ্য দিয়ে আপনাকে কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ কোনো সুবিধা দিচ্ছেন না, বরং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী বা সমাজকে সহায়তা করছেন।

কোথাও প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্য কোনো কর্মকর্তাকে উৎকোচ দেওয়াটাও অমর্যাদাকর। কোনো কোনো সমাজে অবশ্য সাধারণ কিছু সুবিধা চাওয়ার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে (যেমন, কোনো কিছু করার জন্য তাঁরা চা বা ঠান্ডা পানীয় পানের খরচ) কিংবা সকালে অফিস খুলে তথ্য দিতে হবে, এসব কথা বলে কিছু সুবিধা তথা অর্থ দাবি করেন। এ ধরনের পরিবেশে হয়তো আপনি তাঁদের কিছু না দিলে কাজই করতে পারবেন না। কিন্তু এই লেনদেনগুলোর কারণে হয়তো আপনার পুরো অনুসন্ধানই প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। যত অল্প টাকাই হোক না কেন, এটিকে ঘুষ হিসেবেই বিবেচনা করা হবে। একসময় তাঁরা তাঁদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গণমাধ্যমকে বলে দিতে পারেন যে আপনি তাঁদের ঘুষ দিয়েছেন। এ ধরনের পরিস্থিতি সামলাতে আপনাকে বিশেষ কৌশল গ্রহণ করতে হবে। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে পাঠককে যুক্তিযুক্তভাবে বোঝাতে হবে যে, কোন পরিস্থিতিতে পড়ে আপনি টাকা দিয়েছেন। শুধুই অর্থের ওপর ভিত্তি করে লেনদেনের সম্পর্ক বজায় রাখার চেয়ে সোর্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করাটা সব সময়ই ভালো পন্থা। এটি আপনি করতে পারেন আপনার কাজের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে।

প্রতিবেদন পিচ বা প্রস্তাব করা

আপনার প্রতিষ্ঠান যদি আপনাকে কোনো প্রতিবেদন করার দায়িত্ব দেয় (অ্যাসাইন করে), তাহলে যে পরিকল্পনার বিবরণ আমরা আলোচনা করেছি, সেখান থেকে শুরু করুন। কিন্তু আপনি ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হলে পরিকল্পনায় এমন যাবতীয় তথ্য থাকতে হবে, যাতে আপনার প্রস্তাব দেখে সম্পাদক প্রতিবেদনটিতে আগ্রহী হন। এখানে প্রস্তাবটি হচ্ছে, খবরের প্রতি সম্পাদকের সমর্থন আদায়ের জন্য একটি উপস্থাপনা। এতে নিচের বিষয়গুলো থাকা জরুরি:

- আকর্ষণীয় শিরোনাম
- প্রতিবেদনের পরিষ্কার রূপরেখা
- কেন প্রতিবেদন ওই প্রকাশনার পাঠকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
- কাজের পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- সময়সূচি বা টাইমলাইন
- বাজেট

কোনো কোনো মিডিয়া হাউস প্রতিবেদনটি তাদের পাঠকদের জন্য কীভাবে উপস্থাপন (লেখা, ছবি, গ্রাফিকস) করা উচিত, সে বিষয়েও আপনার মতামত আশা করতে পারে; আবার কেউ কেউ বিষয়টি তাঁদের নিজেদের সম্পাদক ও ডিজাইনারদের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন। এটাও মাথায় রাখবেন, আপনার প্রতিবেদনের প্রস্তাব তাঁদের পছন্দ না-ও হতে পারে। এ কারণে প্রতিবেদন প্রস্তাব উপস্থাপনের সময় বিস্তারিত অনুসন্ধান পরিকল্পনা বাদ দিয়ে শুধু অত্যাবশ্যকীয় তথ্যগুলো তুলে ধরুন, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো, যাতে আপনি অন্য কোনো বার্তাকক্ষের কাছেও প্রস্তাবটি নিয়ে যেতে পারেন।

অনুসন্ধান একা করবেন, নাকি দল গড়বেন

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন একা একাই করে ফেলার অনেক কারণ পাওয়া যাবে:

- প্রতিবেদনের পরিসর আপনি একাই সামাল দেওয়ার মতো
- আপনার কাছে প্রায় সব রিসোর্স বা যোগাযোগ আছে
- সহকর্মীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত নন

তবে কোনো কোনো অনুসন্ধান প্রায়ই এমন অবস্থায় চলে যায়, যেটি একজনের পক্ষে করে ফেলা কঠিন হয়ে ওঠে। আরও অনেকে তখন সেখানে হাত লাগালে কাজটির ব্যবস্থাপনা ঠিকঠাকভাবে করা যায়। একই সঙ্গে একটি প্রতিবেদনের পেছনে অনেকের দৃষ্টি থাকলে নতুন নতুন অনেক আঙ্গিকও বেরিয়ে আসে।

আপনি যদি একটা দল হিসেবে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তবে আরও কিছু পদক্ষেপ প্রয়োজন হবে এবং সে জন্য পরিকল্পনা করতে হবে। সবার আগে এবং সবচেয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত হলো, প্রকল্প ব্যবস্থাপক কে হবেন। তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, তিনি দলের সব সদস্যের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে সমন্বয় করবেন। দ্বিতীয় ধাপ হলো, একটি কর্মশালা আয়োজন করা, যেখানে অনুসন্ধানের বিষয়ে সদস্যরা তাঁদের চিন্তাগুলো তুলে ধরতে পারেন এবং একটা স্পষ্ট করণীয় তালিকা তৈরি করা সম্ভব হয়।

আপনাকে এ বিষয়ে একটি কাঠামো ঠিক করে নিতে হবে:

- দলের সদস্যরা কখন-কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন
- সম্পাদনার প্রক্রিয়া কেমন হবে
- অনুসন্ধানের সময় বাধা এলে কীভাবে সামলানো হবে
- চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে কীভাবে দলের সবাই একমত হবেন
- কোন ধরনের খরচ বহন করা হবে
- অনুসন্ধানের প্রয়োজনে আড়ি পাতা, ছদ্মবেশ ধারণ করা কিংবা কোনো নথি পেতে কাউকে টাকা দেওয়া যাবে কি না

এ ছাড়া অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় দলের কোন সদস্যের কী ভূমিকা হবে, তা সুস্পষ্ট করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানো যায়। দলের কোনো সদস্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে থাকলে, তিনি বা তাঁরা অনুসন্ধানের বিষয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের দূরে রাখবেন। সংশ্লিষ্ট মিডিয়া প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব এবং অনুসন্ধান প্রকল্পের ব্যবস্থাপকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভূমিকার বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে হবে। কখনো কখনো চুক্তিপত্র সইয়ের মাধ্যমে সেটি করতে হবে।

দলীয় সদস্যদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে: দলের সদস্যরা কি অনুসন্ধানের আগাগোড়া সবকিছু জানেন? সাধারণ নাগরিক হিসেবে দলের সদস্যরা কেন এই বিষয় নিয়ে আগ্রহী হবেন? অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উত্তম চর্চা ও মূল্যবোধও আলোচনার অংশ হওয়া উচিত।

প্রকল্প ব্যবস্থাপকই কার্যত অনুসন্ধানের নেতৃত্ব দেন। তাঁকেই পুরো দলের লক্ষ্য ক্রমাগত সামনে নিয়ে আসতে হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করতে হয়। প্রকল্প ব্যবস্থাপককে এ-ও নিশ্চিত করতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রতিবেদনটি স্থানীয় কোনো ইস্যুতে জনগণের বোঝাপড়া তৈরিতে সাহায্য করবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক একই সঙ্গে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তি এবং অনুসন্ধানী দলের সদস্যদের মধ্যে সংযোগসেতু হিসেবে কাজ করেন।

স্পটলাইট

আঞ্চলিক এবং একটি নিউজরুম টিমের অনুসন্ধানের একটি বড় উদাহরণ 'স্পটলাইট টিম'।

২০০২ সালে বোস্টন গ্লোব পত্রিকার সাংবাদিকেরা অনুসন্ধানের মাধ্যমে জানতে পারেন, বোস্টন ক্যাথলিক গির্জার কিছু কার্ডিনাল ও বিশপ সেখানকার যাজকদের হাতে শিশুদের যৌন নিপীড়নের শিকার হওয়ার ঘটনা গোপন করেছেন। বোস্টন গ্লোবের সেই প্রতিবেদনের পর মার্কিন অন্যান্য মিডিয়া সেদিকে নজর দেয় এবং অন্যান্য অঞ্চলে অনুসন্ধান চালিয়ে একই ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করে।

এই অনুসন্ধান নিয়ে সিনেমা নির্মিত হয় এবং ২০১৫ সালে 'স্পটলাইট' নামে তা মুক্তি পায়।

বনাম

পানামা পেপারস

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পারস্পরিক সহযোগিতার আন্তর্জাতিক ও চমৎকার এক উদাহরণ হলো 'পানামা পেপারস'।

প্রায় এক বছর ধরে ৭০টির বেশি দেশের চার শতাধিক সাংবাদিক একটি টিম হিসেবে পানামার একটি আইনি প্রতিষ্ঠানের ফাঁস হওয়া তথ্য নিয়ে অনুসন্ধান চালান। এতে অনেক রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড়, অপরাধী এবং আরও অনেকের নাম বেরিয়ে আসে, যাঁরা বেআইনিভাবে পানামায় অফশোর অ্যাকাউন্ট করেছেন।

১ কোটি ১০ লাখের বেশি নথি বিশ্লেষণ করা হয়; যা কখনো এককভাবে একজন সাংবাদিকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই উদাহরণে বোঝা যায়, অনুসন্ধানের জন্য একটা দল আকারে কত বড় হবে, তা তথ্যের পরিমাণ এবং কোন সাংবাদিকেরা জড়িত হচ্ছেন, তার ওপর নির্ভর করে।

বিশাল সেই অনুসন্ধান বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক কেলেঙ্কারির ঘটনা হিসেবে ২০১৬ সালে একযোগে বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

দলগত অনুসন্ধান মান বাড়ায়

দলগত প্রতিবেদন করার লক্ষ্য সামনে রেখে ২০১৮ সালে অনুসন্ধানী অনুষ্ঠান 'অনুসন্ধান' যাত্রা শুরু করেছিল। তিনজন প্রতিবেদক মিলে এই অনুষ্ঠান করতেন। তাঁদের একজন টিম লিডার ছিলেন, যিনি দিকনির্দেশনা দিতেন। প্রতিটি প্রতিবেদন এক‌েকজন প্রতিবেদকের নামে গেলে সেখানে প্রত্যেকে কাজ করতেন, প্রত্যেকে কোনো না কোনো ভূমিকা রাখতেন। এ কারণে প্রথম পর্ব থেকে 'অনুসন্ধান' ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রথম প্রতিবেদনে অনুসন্ধানী দলটি হাজারো নথি ঘেঁটে, শত তথ্যপ্রমাণ হাজির করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে এমন একটি প্রতিবেদন করে, যা তখন আলোড়ন সৃষ্টি করে। দলটি মূলত দেখায়, অলাভজনক হবার পরও কীভাবে ছাত্রদের দেওয়া টিউশন ফি শিক্ষার পেছনে খরচ না করে ব্যক্তিগত তহবিলে চলে যায়।

'দলগত প্রচেষ্টা ছাড়া এই প্রতিবেদন করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটির তিন বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব জোগাড় করেছিলাম। সেগুলো পর্যালোচনা করে সেখান থেকে অনিয়ম খুঁজে বের করা, তারপর মাঠপর্যায়ের প্রমাণগুলো জোগাড় করা– সব মিলিয়ে কঠিন ও বড় কাজ ছিল।'– বলছিলেন 'অনুসন্ধান' দলের দলনেতা বদরুদ্দোজা বাবু। এই অনুষ্ঠানের আগেও তিনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেছেন কিন্তু 'অনুসন্ধান'-এ করা তাঁর প্রতিবেদনগুলো অনেক বেশি গভীর ও বিস্তারিত বলে তিনি মনে করেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অনুসন্ধানটিতে মোট ৬০টি আয়-ব্যয়ের হিসাব বিশ্লেষণের পর, সেগুলো একজন বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, যিনি ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিংয়ে অভিজ্ঞ। দলটি এখানেই থেমে থাকেনি, ওই হিসাবপত্র থেকে আর্থিক লেনদেনের নানা সূত্র ধরে তারা মাঠপর্যায়ে ব্যাপক তদন্ত চালায়। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে কথা বলে। ভুক্তভোগী কেউ কেউ আবার প্রতিবেদকের সঙ্গেও যোগাযোগ করছিল। দীর্ঘ এই অনুসন্ধান করার পর তারা ব্যাপক মাত্রায় অনিয়ম ও দুর্নীতির খোঁজ পায়। মাঠপর্যায়ে কাজ করার পর তারা এত অনিয়মের তথ্য জোগাড় করেছিল, যা এক প্রতিবেদনে আঁটানো কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে তারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে দুটি প্রতিবেদন তৈরি করে।

একসঙ্গে তিনজন প্রতিবেদক কীভাবে কাজটি এগিয়ে নিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে বদরুদ্দোজা বাবু বলছেন, 'রিপোর্টারদের সবার গুণ সমান নয়—কেউ ভালো তথ্য জোগাড় করতে পারেন, কেউ ভালো যাচাই করতে পারেন, কেউ ভালো সাক্ষাৎকার, কেউবা ভালো লিখতে পারেন। দলগত অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সুবিধাটাই এখানে। আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান বিষয়ে যে প্রতিবেদক যে কাজে দক্ষ, তাঁকে সেই কাজটি দেওয়া হয়েছে। ফলে দ্রুত কাজটি নামানো সম্ভব হয়েছে।'

এই দল এমন আরও বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে। তাঁদের প্রতিটি প্রতিবেদনে গবেষণা ছিল, অনেক তথ্যপ্রমাণ ছিল। 'বিক্রি হচ্ছে জিপিএ-৫' নামে একটি প্রতিবেদনে একই সঙ্গে দুজন প্রতিবেদক উপস্থাপনা করেন। একজন আন্ডারকাভার রিপোর্টিং করেছেন, আরেকজন জবাবদিহি আদায় করেছেন। 'আপনার দলে একজন নারী প্রতিবেদক থাকা জরুরি।

যেমন জিপিএ-৫ স্টোরিতে আমরা নারী রিপোর্টারকে একজন অভিভাবক সাজিয়েছিলাম। এতে খুব সহজে পরীক্ষার ফলাফল পরিবর্তন করার চক্রটিকে সামনে আনতে পেরেছি। অন্যজন প্রশ্নে অর্থাৎ জবাবদিহি আদায়ে ভালো, সে সেটিই করেছে।'– বলছিলেন বদরুদ্দোজা বাবু।

এই দলের করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোর প্রভাবও ছিল অনেক। দুর্নীতিবাজদের কেউ কেউ চাকরি হারিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কয়েকটি প্রতিবেদন নিয়ে অভিযুক্তরা সংবাদ সম্মেলন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, মামলাও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলছিলেন 'অনুসন্ধান' টিম লিডার বদরুদ্দোজা বাবু, 'বড় অনুসন্ধানে এমন অনেক প্রতিবন্ধকতা আসবে। সুতরাং আপনাকে সাবধান হতে হবে। সতর্কভাবে এগোতে হবে। ভালোভাবে তথ্য যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে। শতভাগ নির্ভুল হতে হবে। এগুলো নিশ্চিত করতে যেমন পরিশ্রম করতে হবে, তেমনি দক্ষতারও প্রয়োজন। সেটি দলগত অনুসন্ধানে সম্ভব।'

দলগত একটি অনুসন্ধানে দলনেতার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় নির্ধারণ থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ের কাজ উঠিয়ে নিয়ে আসা, দিকনির্দেশনা দেওয়া, ভালো একটি স্টোরি টেলিং দাঁড় করানো দলনেতার নেতৃত্ব ছাড়া সম্ভব নয়। 'অনুসন্ধান'-এর ক্ষেত্রেও তা-ই ছিল। দলটির টিম লিডার বলছেন, 'যেকোনো প্রতিবেদন ওপর থেকে একজনের দেখা জরুরি। এতে যেমন দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, তেমনি ভুলভ্রান্তিগুলো চোখ এড়ায় না। আর বড় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করে সেটি বাস্তবায়ন করার জন্যও একজনের নির্দেশনা থাকা জরুরি।'

সময় ব্যবস্থাপনা করবেন কীভাবে

সাংবাদিকতার ধরনটাই এমন, সেখানে একটি নির্দিষ্ট ডেডলাইন থাকবে। একই সঙ্গে, বর্তমান এই তথ্য-জোয়ারের মধ্যে পাঠককে কোনো প্রতিবেদন পড়াতে চাইলে তা আকর্ষণীয় এবং 'সংবাদযোগ্য' হতে হবে। ফলে সময় ব্যবস্থাপনার বিষয়টি মাথায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে থাকছে কিছু পরামর্শ:

অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা

সবাই ভিন্ন ভিন্নভাবে কাজ করে, তাই আপনার দুর্বলতাগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করুন এবং কোনো একটি ধাপে গিয়ে নিজেকে আটকে ফেলবেন না। যেমন একটি অনুসন্ধানের শুরুতে আপনার মনে হতে পারে, বিষয়টিতে আরও বেশি পড়াশোনা করা প্রয়োজন। কিন্তু পড়তে সময় লাগে। এবং বেশি পড়তে থাকলে আপনি আরও অনেক রেফারেন্স পেতে থাকবেন। এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এত কিছু পড়ে ওঠা সম্ভব হবে না। ভালো উপায় হতে পারে ইন্টারনেটে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কিছু সার্চ করে জেনে নেওয়া। যেমন কি-ওয়ার্ডকে উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতর রেখে সার্চ দেওয়া। এতে অপ্রাসঙ্গিক অনেক লেখা ফিল্টার হয়ে যাবে। আপনার প্রতিবেদনের জন্য আগ্রহ-উদ্দীপক কিছু পাওয়া গেলে তার ওয়েব ঠিকানা বুকমার্ক করে রাখুন, যাতে পরে প্রয়োজনের সময় সহজে খুঁজে পান এবং সময় নষ্ট না হয়।

একইভাবে, শুধু একজন বিশেষজ্ঞের ওপরই সব আশা-ভরসা রাখবেন না। প্রাসঙ্গিক যত মানুষের সঙ্গে সম্ভব, বিস্তৃতভাবে যোগাযোগ করুন। অনুসন্ধানের শুরুর পর্যায়ে, আপনাকে ঘটনার গভীরে যাওয়ার বদলে বরং বিস্তৃত পরিসরে খোঁজ চালাতে হবে।

আপনাকে একটি সময়কাঠামোও ঠিক করতে হবে। এতে বুঝতে পারবেন, গবেষণার কোন পর্যায়ে কতটা সময় দেওয়া যাবে। অনুসন্ধানটি ভিন্ন কোনো বাঁক নিলে শুরুর গাইডলাইন দেখে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। যা পেতে চাইছেন, তা পাওয়ার জন্য বিকল্প উপায় খুঁজতে হবে।

অনুমান বদলে গেলে কীভাবে প্রস্তুতি নেবেন

ধরা যাক, প্রাথমিক কিছু গবেষণার পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আপনার গোটা অনুমানটাই বদলে গেছে। নতুন তথ্য পাওয়ার কারণে আপনার খবরের বিষয়টি নতুন করে সাজাতে ভয় পাবেন না। ভালো অনুসন্ধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো নমনীয়তা। প্রতিবেদনের শুরুতে যে ধারণা ছিল, তাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করবেন না এবং নতুন পাওয়া তথ্যগুলো আদি ধারণার মধ্যে জুড়ে দেওয়ার কথা ভাববেন না।

নতুন করে যে অনুমানটি তৈরি করলেন, তার পটভূমি নিশ্চিত হলে আপনার গবেষণাকে আরও গভীরে নিতে হবে এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো ছেঁটে ফেলে দিতে হবে। নিজের কাজ ছেঁটে ফেলতে একটু খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু করতেই হবে। পুরোনো নথি/নোটগুলো ফাইল করে রাখতে পারেন, যা ভবিষ্যতে কোনো প্রতিবেদনে কাজে লাগতে পারে। কর্তৃপক্ষের বা কর্মকর্তা পর্যায়ের কারও অর্থবহ মন্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করুন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র এবং রেফারেন্সগুলো আবারও দেখে নিন। আনুমানিক বিমূর্ত বিষয়গুলোর বদলে আপনাকে এখন খুঁজতে হবে বাস্তব, সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ ও রেফারেন্স। এবং এই পর্যায়েই আপনাকে বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আপনি নিশ্চয়ই কোনো মামলায় জড়িয়ে পড়তে চাইবেন না। ফলে যেটার সত্যতা নিশ্চিত হতে পারবেন না, ছেঁটে ফেলুন। আপনার নোটের সঙ্গে মেলে না কিংবা বিপরীতমুখী তথ্যগুলো পর্যালোচনা করে দেখুন সেগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কি না। পক্ষপাতদুষ্ট সূত্র বিষয়টির কী ব্যাখ্যা দিচ্ছে। সব ক্ষেত্রে সবার মন্তব্য রেকর্ড রাখুন। তথ্য নিশ্চিত করুন, যাচাই করুন এবং আবারও যাচাই করুন।

কোন ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন এল, তা সংশ্লিষ্ট সম্পাদককে জানিয়ে রাখুন, যাতে তিনি প্রয়োজনে পুনরায় পরিকল্পনা করতে পারেন, পাতায় পরিবর্তন আনতে পারেন। জানানোর বিষয়টি আপনাকে যত দ্রুত সম্ভব করতে হবে। মানহানি বা মামলার ঝুঁকি থাকলে বিষয়গুলো সম্পাদককে জানিয়ে রাখুন। এই ঝুঁকি থেকে রক্ষা পেতে আপনার সম্পাদক প্রয়োজনে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি আইনজীবীকে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ নিতে পারেন।

পরবর্তী অধ্যায় আপনাকে শেখাবে, গবেষণার শুরুতেই কীভাবে ডেটা সুরক্ষার উদ্যোগ নিতে হয়।

৪

অধ্যায় ৪

তথ্য-উপাত্ত সুরক্ষার কৌশল

অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা তাঁদের গবেষণার সময় প্রচুর পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করেন, যার বেশির ভাগ সংরক্ষিত থাকে মোবাইল ফোন কিংবা কম্পিউটারে। ডিজিটাল তথ্য নিয়ে কাজ করার সময় কীভাবে তথ্য সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা হুমকি প্রতিরোধ করা যায়, সে বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। একটি অনুসন্ধান পরিচালনার সময় অন্যতম প্রধান বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত যাতে তথ্যের সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ সব সময় নিরাপদ থাকে। এই অধ্যায়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা হুমকি এবং সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন সফটওয়্যার ও উপকরণ নিয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে মূলত প্রচলিত কম্পিউটার ব্যবস্থা (ম্যাক, উইন্ডোজ) এবং স্মার্টফোনগুলোর (অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস) প্রতি মনোযোগ থাকবে।

ডেটা সুরক্ষিত রাখা

ডেটা সুরক্ষিত রাখার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষভাবে আপনি যদি কোনো বিতর্কিত বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন, যেখানে অনেক ক্ষমতাবান ব্যক্তির সংযোগ আছে এবং আপনি এমন দেশে কাজ করছেন, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা সীমিত। যারা চায় না আপনার অনুসন্ধানটি প্রকাশ হোক, তারা হয়তো নানাভাবে আপনাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে বা আপনার গবেষণার ওপর নজরদারি চালাতে পারে। সব সময় এই বিষয়গুলো মাথায় রাখা হয়তো ক্লান্তিকরও হয়ে উঠবে। কিন্তু আপনার নিজেকে এমন প্রশ্ন করতে হবে যে, কারা এই অনুসন্ধান বাধাগ্রস্ত করতে চাইতে পারে। আরও জিজ্ঞাসা করুন: কী কী পন্থায় তারা তা করতে পারে। আপনার গবেষণা কি ব্যক্তিসূত্র, নাকি ডিজিটাল সূত্রনির্ভর। আপনার কাজ রক্ষা করতে কোন নিরাপত্তা টুল ব্যবহার করা উচিত।

বলা বাহুল্য, আপনার সূত্রদেরও সুরক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। তাঁরা যোগাযোগের যেসব মাধ্যম ব্যবহার করছেন, সেসব প্রযুক্তিগত মাধ্যমে অন্যের অনুপ্রবেশ থেকে নিজেদের সুরক্ষার টুলস সম্পর্কে সচেতন কি না, তা নিশ্চিত করুন। তারপরও সচেতন থাকতে হবে যে কখনোই শতভাগ সুরক্ষা সম্ভব নয়। আপনি শুধু আপনার তথ্য ও ডিভাইসে প্রতিপক্ষের অনুপ্রবেশকে কঠিন, ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘায়িত করতে পারেন।

এই অধ্যায়ে সুরক্ষা কৌশলগুলোর বিষয়ে পর্যালোচনা রয়েছে, যা আপনার ডিভাইস বা যন্ত্রগুলোকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে। কোনো সফটওয়্যার (এখানে প্রস্তাবিত) ইনস্টল করার আগে প্রতিটি অ্যাপ্লিকেশনের সাম্প্রতিকতম সংস্করণটি খুঁজে নিন; কেননা, ইন্টারনেট প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। খুব সস্তা কিছু বেছে নেবেন না। বাজারে সফটওয়্যারগুলোর দুই ধরনের সংস্করণ পাওয়া যায়– একটি বিনা মূল্যে, অন্যটি কিনতে হয়। যাচাই করুন কোন প্রোগ্রামটি আপনার প্রয়োজন সবচেয়ে ভালোভাবে পূরণ করবে এবং তারপর সিদ্ধান্ত নিন, কোন সংস্করণটি ব্যবহার করবেন। আমরা ওপেন সোর্স সফটওয়্যার খোঁজার পরামর্শ দিচ্ছি। কারণ, এ ধরনের সফটওয়্যারের সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্য আইটি বিশেষজ্ঞরা যাচাই করতে পারেন। প্রাইভেট সফটওয়্যার সাধারণত তাদের কোড দেখার অনুমতি দেয় না, যার অর্থ শুধু সফটওয়্যারের মালিক ছাড়া আর কেউ এর সুরক্ষা হুমকি পরীক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে সেই অনুমতি থাকে, তাই সম্ভাব্য সুরক্ষা গলদ খুব দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

পাসওয়ার্ড সুরক্ষা

পাসওয়ার্ড অনেক কিছুর জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি ফোন বা কম্পিউটার সচল করতে (আনলক) সাধারণত পাসওয়ার্ড দিতে হয়। আপনার ওয়াই-ফাই রাউটার বা ই-মেইল প্রোগ্রামে লগইন করতেও একটি পাসওয়ার্ড দরকার হয়। এমনকি, নিজের ডেটা এনক্রিপ্ট করার সময়ও আপনার কাছে একটি পাসওয়ার্ড চাওয়া হয়। অতএব একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড আপনার তথ্য সুরক্ষার জন্য বড় পদক্ষেপ। আপনি যত ঘন ঘন আপনার পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করবেন, আপনি তত সুরক্ষিত থাকবেন। আপনার ডিভাইস বা যন্ত্রে অথবা (মেসেজিং) অ্যাকাউন্টে লগইন করতে

ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড কমপক্ষে প্রতি তিন মাসে একবার বদলানো উচিত। আপনার ওয়াই-ফাই রাউটারের পাসওয়ার্ড বছরে অন্তত দুবার পরিবর্তন করা উচিত। অন্য কোনো কাজের জন্য ব্যবহৃত পাসওয়ার্ড বছরে কমপক্ষে একবার পরিবর্তন করুন।

শক্তিশালী পাসওয়ার্ড তৈরির কয়েকটি পরামর্শ:

- প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য ভিন্ন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
- অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় এমন কোনো শব্দ কখনো ব্যবহার করবেন না
- পরিবারের সদস্য, বন্ধু বা পোষা প্রাণীর নাম কিংবা জন্মতারিখ কখনো ব্যবহার করবেন না
- দীর্ঘ পাসওয়ার্ড তৈরির চেষ্টা করুন, শক্তিশালী একটি পাসওয়ার্ডে প্রায় ১৫টি অক্ষর থাকে
- এলোমেলো ছোট হাতের অক্ষর এবং বড় হাতের অক্ষর, বিশেষ অক্ষর বা চিহ্ন ও সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করুন

জটিল পাসওয়ার্ড মনে রাখতে বেশির ভাগ মানুষের সমস্যা হয়। একটি বিকল্প হচ্ছে পাসফ্রেজ ব্যবহার করা যেমন: আপনার পাসওয়ার্ড পরীক্ষা করতে এবং এটি ভাঙতে একটি নিয়মিত হোম কম্পিউটার বা একটি খুব শক্তিশালী সুপার কম্পিউটারের কতক্ষণ প্রয়োজন, সে বিষয়ে একটি ধারণা দিতে বিভিন্ন সহায়ক ওয়েবসাইট রয়েছে। এ রকম একটি ওয়েবসাইট হলো password.kaspersky.com। এ ধরনের ওয়েবসাইটগুলোতে আপনার আসল পাসওয়ার্ড দিলে আপনার সুরক্ষার ঝুঁকি তুলে ধরবে, তাই পরীক্ষা করার জন্য আসলটির মতো একটি অনুরূপ পাসওয়ার্ড দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

আপনি যদি আপনার সব অ্যাকাউন্টের প্রতিটি পাসওয়ার্ড মনে রাখতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে কিপাস (keepass.info) বা সেফ ইন ক্লাউডের (safe-in-cloud.com) মতো অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করুন। তারা আপনার পাসওয়ার্ডগুলো নিরাপদে সংরক্ষণ করে, তথ্যটি এনক্রিপ্ট করে এবং শুধু (খুব শক্তিশালী) মাস্টার পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেই এগুলো দেখা সম্ভব। এই টুলগুলোতে সাধারণত একটি পাসওয়ার্ড জেনারেটরও যুক্ত থাকে। আপনার মোবাইল ফোনের অ্যাপস্টোরেও আপনি এ ধরনের টুল খুঁজে পাবেন।

পাসওয়ার্ড জমা রাখা এবং সুরক্ষিত করা ছাড়াও ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) ব্যবহারের জন্যও জোর সুপারিশ করা হয়। এই পাসওয়ার্ডগুলো কেবল এক সেশনে জন্য কার্যকর এবং একটি স্ট্যান্ডার্ড পাসওয়ার্ডের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, যা টু-ফ্যাক্টর-অথেনটিকেশন (টুএফএ) হিসেবে পরিচিত। ওটিপি টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে পাঠানো হয়। গুগল অথেনটিকেটর (অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস), অথেনটিকেটর প্লাস (অ্যান্ড্রয়েড) এবং টুএসটিপি অথেনটিকেটর (আইওএস) অ্যাপের মতো স্মার্টফোন অ্যাপ বা একটি বিশেষ টোকেনের মাধ্যমে ওটিপি তৈরি (জেনারেটেড) হয়। ফেসবুক, জিমেইল বা টুইটারের মতো অনেক পরিষেবা এরই মধ্যে ওটিপির ব্যবহার প্রচলন করেছে। কিছু বিকল্প ই-মেইল পরিষেবা সরবরাহকারী (যেমন, মেইলবক্স ডট অর্গ) টু-ফ্যাক্টর-অথেনটিকেশনের মতো সুবিধা দিয়ে থাকে। ওটিপি ব্যবহারকারী পরিষেবাগুলোর একটি নিয়মিত হালনাগাদ তালিকা twofactorauth.org ওয়েবসাইটে পাওয়া যেতে পারে।

ডেটা অ্যাট রেস্ট বা অলস তথ্য

আপনার ডেটা যখন কোনো হার্ড ড্রাইভ বা ক্লাউড সার্ভারে থাকে, তখন সে অবস্থাকে বলা হয় 'ডেটা অ্যাট রেস্ট বা অলস তথ্য'। ডেটার এমন আরও দুটি অবস্থা আছে: 'ডেটা ইন ইউজ' বা ব্যবহারে থাকা তথ্য এবং 'ডেটা ইন মোশন' বা চলমান তথ্য। এই অধ্যায়ে আপনি জানবেন কীভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যগুলো সুরক্ষিত রাখা যায়। আপনার নেটওয়ার্কের ফোল্ডারে অন্য কার প্রবেশাধিকার আছে, তা কীভাবে নজর রাখতে পারেন, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে এই সাব-সেকশনে।

প্রথম পদক্ষেপটি হলো আপনার ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করা। অনেক সময় কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পাসওয়ার্ড থাকে না; থাকলেও শুধু সংক্ষিপ্ত একটি থাকে। এটি সহজেই ডিভাইস বা যন্ত্রে প্রবেশ করতে হ্যাকারদের সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ, আপনার কম্পিউটারটি নিয়মিত অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ক্ষমতাসহ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা। উইন্ডোজ সিস্টেমগুলো বিশেষত সাধারণ ব্যবহারকারীদের সব অধিকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে দিয়ে রাখে। তাই আপনার কম্পিউটারে একটি নতুন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাকাউন্ট তৈরি করুন এবং শুধু প্রয়োজন হলেই তা ব্যবহার করবেন। আপনার সাধারণ অ্যাকাউন্টের ব্যবহারকারীর অধিকার সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমাবদ্ধ করুন। এটি আপনাকে ম্যালওয়্যার থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ, সাধারণ অ্যাকাউন্টে আপনার অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার অধিকার থাকবে না। আরও পরামর্শ দেওয়া হয় কম্পিউটারে গেস্ট অ্যাকাউন্ট না রাখার। এ ধরনের অ্যাকাউন্টে অধিকারের অপব্যবহার রোধ করতেই এই সুপারিশ।

এনক্রিপশন

পরবর্তী পদক্ষেপটি হচ্ছে আপনার যন্ত্র বা ডিভাইস এবং এতে থাকা ডেটা বা তথ্য এনক্রিপ্ট করা। এনক্রিপশন মানে বার্তা কিংবা তথ্য এনকোড করা অথবা সাংকেতিক ভাষায় মুড়ে রাখা, যা কেবল অনুমোদিত ব্যক্তি তার কাছে সঠিক পাসওয়ার্ড থাকলে সেটি পড়তে পারবেন বা ফাইলটি ডিক্রিপ্ট করতে বা খুলতে পারবেন। অতএব, হ্যাকার যাতে সহজেই সাংকেতিক ভাষার মোড়ক খুলতে বা ভাঙতে না পারে, সে জন্য একটি শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, এনক্রিপশন আপনার যন্ত্র বা ডিভাইসের কাজ করার গতি স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য কমিয়ে দেবে।

হার্ড ড্রাইভ এনক্রিপশন

কল্পনা করুন, আপনার বাড়ির সামনে একটি বড় গেট অচেনা লোকদের বাড়িতে প্রবেশ ঠেকাচ্ছে। এই গেট তখনই নিরাপদ, যখন আপনি এটিকে ভেতর থেকে বেশ কয়েকটি শিকল দিয়ে বন্ধ করে রাখবেন। এই গেট আপনার হার্ড ড্রাইভের মতো। হার্ড ড্রাইভটি এনক্রিপ্ট করা আপনার কম্পিউটারে প্রতিরক্ষা শিকলের মতো কাজ করে, যা হ্যাকারদের অনুপ্রবেশ কঠিন করে তোলে। চেইনগুলো যে যথেষ্ট শক্তিশালী, তা নিশ্চিত করতে এইএসটুফাইভসিক্স (AES256) ব্যবহার করুন। এ পর্যন্ত সবচেয়ে সফল এনক্রিপশন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। হার্ড ড্রাইভ এনক্রিপ্ট করার জন্য প্রস্তাবিত অন্য সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে আছে ভেরাক্রিপ্ট (VeraCrypt) উইন্ডোজের জন্য বা ফাইলভল্ট (FileVault) ম্যাকের জন্য।

ডেটা এনক্রিপশন

আপনার হার্ড ড্রাইভ এনক্রিপ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটিতে সংরক্ষিত সব ডেটাও লক বা তালাবদ্ধ হয়ে যাবে। যদি আপনি আপনার ডেটা বা তথ্য দ্বিগুণ সুরক্ষিত করতে চান, তাহলে ডেটাও আলাদাভাবে এনক্রিপ্ট করতে পারেন। এর ফলে সম্ভাব্য অনুপ্রবেশকারীরা আপনার যন্ত্রে বা ডিভাইসে রাখা তথ্য বা নথিগুলো গোপনে পড়তে পারবে না। ডেটা এনক্রিপশনের জন্য সুপারিশ করা সফটওয়্যারের মধ্যে আছে উইন্ডোজের জন্য বিটলকার (Bitlocker) ও ভেরাক্রিপ্ট এবং ম্যাকের জন্য ফাইলভল্ট বা ক্রিপ্টো ডিস্ক (Crypto Disk)। এ ছাড়া সব ফাইল একত্রে একটি প্যাকেট করে (লিনাক্স) এ সেভেন-জিপ (7-Zip) ব্যবহার করে তা এনক্রিপ্টেড আর্কাইভ করাও সম্ভব।

ইউএসবি এনক্রিপশন এবং ব্যাকআপ

একটি ইউএসবি ডিভাইস হলো আরেকটি স্থান, যেটাতে সাংবাদিকেরা ইনফরমেশন এবং ডেটা বা তথ্য-উপাত্ত জমা রাখেন, তাই এই ডিভাইসগুলোকেও কম্পিউটার ও ফোনের মতো সুরক্ষিত করা দরকার। আপনিও হয়তো এই প্রাথমিক ডিভাইসগুলোর ব্যাকআপ নিতে একটি ইউএসবি ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণ পরামর্শ হলো, আপনার তথ্যের একাধিক অনুলিপি করে রাখুন। কারণ, যেকোনো সময়েই আপনার ডেটায় সমস্যা দেখা দিতে পারে। ব্যাকআপ বা অনুলিপিগুলো সঞ্চয় করতে বিভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করা নিশ্চিত করুন এবং বিভিন্ন ব্যাকআপ ডিভাইস ও ফাইল এনক্রিপ্ট করতে ভুলবেন না।

ডেটা ইন ইউজ বা ব্যবহারে থাকা তথ্য

'ডেটা ইন ইউজ' বা ব্যবহারে থাকা তথ্য বলতে আপনার ডিভাইসের ওই সব ডেটাকে বোঝায়, যা অব্যাহতভাবে সক্রিয় নথি বা তথ্য দেওয়ার কারণে পরিবর্তন হচ্ছে। এগুলো প্রায়ই কম্পিউটারের র‍্যানডম অ্যাকসেস মেমোরি (র‍্যাম) বা ক্যাশে জমা থাকে। এ ধরনের তথ্য রক্ষায় বিভিন্ন সুরক্ষা প্রোগ্রাম এবং সেগুলোর কাজ নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

ফায়ারওয়াল, অ্যান্টিভাইরাস এবং অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ

আপনি যখন ইন্টারনেটে সংযুক্ত, তখন ফায়ারওয়ালগুলো বিভিন্ন তথ্য পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। তাদের কাজ অনেকটা পানশালার প্রবেশদ্বারে থাকা পাহারাদার বা বাউন্সারের মতো। ফায়ারওয়াল ঠিক করবে কোন 'অতিথি' আপনার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করতে অথবা তথ্য পাঠাতে পারবে। ফায়ারওয়াল ছাড়া কাজ করা মানে ঘরের দরজা খোলা রেখে দেওয়া। যে খোলা দরজা দিয়ে ম্যালওয়ার আপনার ডিভাইসে প্রবেশ এবং সহজেই ক্ষতি করতে পারে। বেশির ভাগ কম্পিউটারে আপনি নিজে নিজেই ফায়ারওয়াল সক্রিয় করতে পারবেন। এর পাশাপাশি ম্যাকাফি, বিটডিফেন্ডার বা ক্যাসপারস্কির মতো এক্সটার্নাল প্রটেকশন সফটওয়্যার ব্যবহারেরও পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

আপনার ডিভাইস থেকে ইন্টারনেটের মতো কোনো নেটওয়ার্কে তথ্য যাওয়ার প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পর আপনার নজর দেওয়া উচিত ম্যালওয়্যার থেকে আপনার ডিভাইসকে রক্ষা করার দিকে। আপনার কাজে নজরদারি করতে বা পাসওয়ার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চুরি করতে পারে এই ম্যালওয়্যার। অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার এই ম্যালওয়্যারগুলো খুঁজে বের করে, তাদের ব্লক করে বা আটকে দেয় এবং মুছে ফেলে। এই প্রোগ্রামগুলো শুধু আপনার কম্পিউটারের জন্যই নয়, আপনার মোবাইল ডিভাইসের জন্যও প্রয়োজনীয়। যে সফটওয়্যারগুলো ব্যবহার করতে পারেন:

উইন্ডোজ এবং লিনাক্স কম্পিউটারের জন্য: ইএসইটি, ক্যাসপারস্কি এবং বিটডিফেন্ডার।

অ্যাপল কম্পিউটারের জন্য: মাইক্রোওয়ার্ল্ড, বিটডিফেন্ডার এবং এভিজি।

অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন: অ্যাভাস্ট মোবাইল সিকিউরিটি।

আইফোন: নরটন এবং লুকআউট।

বেশির ভাগ মানুষই ফায়ারওয়াল সম্পর্কে জানে এবং অন্তত একবার হলেও একটি অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম ইনস্টল করেছে। তবে ব্যবহারে থাকা তথ্যের সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হোস্ট ইনস্ট্রুশন প্রিভেনশন (এইচআইপি) সিস্টেম ইনস্টল করাও গুরুত্বপূর্ণ। এই অতিরিক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কের ওপর নজর রাখে এটা নিশ্চিত করতে যে সব প্রক্রিয়া আইনসম্মত বা বৈধ এবং কোনো নীতি লঙ্ঘন হয়ে থাকলে ব্যবহারকারীকে তা জানায়। ম্যালওয়্যার খুঁজে পেতে, এইচআইপি প্রোগ্রামগুলো কম্পিউটার ব্যবহারের বর্তমান প্রবণতা বা প্যাটার্নের সঙ্গে আপনার নিয়মিত ব্যবহারের অভ্যাস তুলনা করে। এই সুরক্ষা সফটওয়্যার সরবরাহকারীদের একটির নাম ম্যাকাফি।

শুরুতে, সুপারিশকৃত এসব সুরক্ষা প্রোগ্রাম ইনস্টল করার কাজকে বড় বোঝা মনে হতে পারে, তবে এমন সফটওয়্যার প্রোগ্রাম রয়েছে, যা একত্রে তিনটি টুলই সরবরাহ করে। এসব মাল্টিপ্রোডাক্ট সুপারিশ করার কারণ সবচেয়ে খারাপ যেটি ঘটতে পারে, তিনটি আলাদা প্রোগ্রাম ইনস্টল করা হলে সেখানে একটি আরেকটিকে সক্রিয় করবে। সব কটি সিস্টেমের জন্য সমন্বিত টুলগুলোর মধ্যে আছে ম্যাকাফি, বিটডিফেন্ডার বা ক্যাসপারস্কি। মনে রাখবেন, প্রতিবছর বিভিন্ন সংস্থা ও ম্যাগাজিনগুলো বিভিন্ন সরবরাহকারীদের তাদের সুরক্ষা এবং কার্যকারিতার তালিকা প্রকাশ করে। তাই কোনো সুরক্ষা সফটওয়্যার প্যাকেজ কেনার আগে, বর্তমান সেরা ম্যালওয়্যার সুরক্ষা সরবরাহকারী কোনটি, সে বিষয়ে গবেষণা করে নিন। শুরু করতে পারেন এখান থেকে: https://www.av-test.org/en/.

পরিচয় গোপন রেখে সার্ফিং

ওয়াই-ফাই রাউটার গুরুত্ব না দেওয়া একটি বড় ঝুঁকি। একজন হ্যাকার আপনার রাউটার ক্র্যাক করতে পারে এবং আপনার সম্পূর্ণ নেটওয়ার্কের প্রবেশাধিকার নিয়ে নিতে পারে। তাই প্রথম দেওয়া ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ডটি পরিবর্তন করে আরও শক্তিশালী আরেকটি পাসওয়ার্ড বসিয়ে নিন। এরপর ওয়াই-ফাই এনক্রিপ্ট করুন। এ মুহূর্তে সবচেয়ে নিরাপদ এনক্রিপশন পদ্ধতি হলো ডব্লিউপিএটু (WPA2), সুতরাং আপনার তথ্য এনকোড করার সময় আপনি এই ফাংশন ব্যবহার করতে পারছেন কি না, তা নিশ্চিত হয়ে নিন। আপনি কীভাবে আপনার রাউটারটি এনক্রিপ্ট করবেন, তা নিয়ে সংশয় থাকলে আপনার ওয়াই-ফাই সেবাদাতা এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। তবে ইন্টারনেটে সংযোগের সবচেয়ে সুরক্ষিত পদ্ধতি হলো এলএএন (LAN) কেবলের মাধ্যমে সংযোগ। বাসায় কাজ করার সময় এই পদ্ধতি ব্যবহার করার জন্য জোর সুপারিশ করা হচ্ছে।

রাউটারটি সুরক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি ইন্টারনেটে গবেষণা সম্পর্কে ভাবা শুরু করতে পারেন। আপনি হয়তো অনুসন্ধানের কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন মূলত ব্যাকগ্রাউন্ড বা পটভূমি-সম্পর্কিত তথ্য এবং সম্ভাব্য উৎসগুলোর খোঁজ করতে। সংবেদনশীল বিষয় অনুসন্ধান করার মানে হচ্ছে আপনার কার্যক্রমে যারা নজর রাখছে, তাদের আরও উৎসুক করে তোলা। তাই আপনার গবেষণা, ভবিষ্যতের উৎস এবং নিজেকে সুরক্ষিত করতে ব্রাউজিং এনক্রিপ্ট করা অপরিহার্য।

নিরাপদে ইন্টারনেট সার্ফ করার জন্য দুটি পদ্ধতি রয়েছে, যা আপনাকে একই সঙ্গে সেন্সরশিপ বা নিয়ন্ত্রক বাধা এড়িয়ে যাওয়ারও সুযোগ করে দেয়: আপনি হয় ভিপিএন (ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক) নয়তো প্রক্সি সার্ভার ব্যবহার করতে পারেন; যা আপনার অবস্থানকে অদৃশ্য করে তোলে। ভিপিএন কীভাবে কাজ করে, দেখতে পারেন এখানে:
https://www.youtube.com/watch?v=zpUHD-PQuZg

ভিপিএন অনেকটা মাস্কের মতো কাজ করে। যেটি আপনার সত্যিকারের অবস্থান লুকিয়ে ফেলে এবং এমন ভাব করে যেন আপনি আরেকটি নেটওয়ার্কে আছেন। বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য অনেক রকমের সফটওয়্যার পাওয়া যায়। যখন ভিপিএন সক্রিয় হবে, আপনি নিজেই ঠিক করে নিতে পারবেন, আপনার অবস্থান কোথায় দেখাতে চান। ভিপিএন সেবার জন্য অনেকেই জেনমেট, সাইবারঘোস্ট বা এক্সপ্রেসভিপিএন (ZenMate, CyberGhost or ExpressVPN) ব্যবহার করতে বলেন। তবে মনে রাখবেন, বেশির ভাগ ভিপিএন সেবা টাকা দিয়ে কিনতে হয়। এই অনলাইন ব্রাউজিং পদ্ধতিতেও অর্থ পরিশোধের বিবরণগুলো সংরক্ষণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে আপনি কিছু চিহ্ন বা ছাপ রেখে যান। একটি বিকল্প, তবে আরও জটিল বিকল্প হলো আপনার নিজস্ব ভিপিএন সেটআপ করা।

ভিপিএন সেবা কোথায় পাবেন, তা নিয়ে আরও তথ্য আছে এখানে: zenmate.com, cyberghostvpn.com বা expressvpn.com। এটি কীভাবে কাজ করে, তা দেখতে পারেন এখানে: www.youtube.com/watch?v=a6ZtEJazqs8

একটি সুপরিচিত প্রক্সি নেটওয়ার্ক হলো টর (দ্য অনিয়ন রাউটার)। টর ব্রাউজার ব্যবহার করার সময় আপনি আসলে আরেকটি আইপি ঠিকানার মাধ্যমে সার্ফ করে থাকেন। এটি সম্ভব হওয়ার কারণ, টর হলো এনক্রিপ্ট করা কম্পিউটার সংযোগগুলোর একটি নেটওয়ার্ক। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর কাছে এই নেটওয়ার্কের অ্যাক্সেস পয়েন্ট রয়েছে। এসব সার্ভারের মধ্যে তিনটি বা তার বেশি রাউটিংয়ের পরে, একজন ব্যবহারকারী এক্সিট বা প্রস্থান পয়েন্টে পৌঁছান। এই আইপি ঠিকানা ওই ব্যক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ২০১৪ সালের নভেম্বরে এফবিআই এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নিরাপত্তা সংস্থা অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের জন্য টর অপব্যবহারকারী ১৭ জনকে শনাক্ত করে। তবে এ ধরনের অভিযানগুলো খুবই নিবিড় ও ব্যয়বহুল। সুতরাং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ-জাতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে একজন সাধারণ নাগরিক বা সাংবাদিকের ওপর নজরদারি করবে, এমন সম্ভাবনা বা ঝুঁকি সামান্যই, যদি না তারা অস্ত্র বিক্রি বা শিশু পর্নোগ্রাফিতে জড়িত হয়। তবে খুব সাবধান থাকতে হবে, যদি আপনি এমন দেশে কাজ করেন, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুব কম এবং যখন তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এমন কাজের জন্য দক্ষ হয়।

টর ব্রাউজার অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের জন্য একটি স্মার্টফোন অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে পাওয়া যায় (Orfox and the add-on Orbot)। প্রক্সি ব্রাউজারগুলো খুঁজছেন এমন আইওএস ব্যবহারকারীদের উচিত অনিয়ন ব্রাউজারে প্রবেশ করা।

ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহার

পাবলিক ক্লাউড বা সবার জন্য উন্মুক্ত ক্লাউড স্টোরেজ যেমন ড্রপবক্স, গুগল ড্রাইভ বা ওয়ানড্রাইভ বিনা মূল্যে ও সহজে ব্যবহার করা গেলেও সংবেদনশীল নথি, ছবি বা অন্যান্য তথ্য লেনদেনের ক্ষেত্রে এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। ক্লাউডে রাখা নথির ওপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং তথ্য সুরক্ষিত রাখার জন্য আপনি সেবাদাতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল।

সঞ্চিত তথ্যে স্বয়ংক্রিয় এনক্রিপশনসহ একটি বিকল্প ক্লাউডভিত্তিক সমাধান হলো ব্লাউক্লাউড (BlauCloud)। ওউনক্লাউডের (ownCloud) ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা এই সেবা ওপেন-সোর্স বা মুক্ত উৎসের ক্লাউড সলিউশন। যেহেতু তথ্যগুলো জার্মানিতে সংরক্ষণ করা হয়, তাই ব্যবহারকারীরা জার্মানির তথ্য সুরক্ষা আইনের সুবিধা লাভ করে থাকেন। অবশ্য এরপরেও আরও সুরক্ষিত পদ্ধতির অর্থ হলো, আপনি আপনার তথ্য যেখানে জমা রাখছেন, সেই হোস্টকে বিশ্বাস করছেন।

ফিজিক্যাল স্টোরেজ

টপ-সিক্রেট বা অতিগোপনীয় নথি চালাচালির ক্ষেত্রে, আপনার কাছে সব সময় ডিজিটাল অনুলিপি না-ও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে প্রতিটি ফাইল স্ক্যান করে সেগুলো হার্ড ড্রাইভে বা ইউএসবি ডিভাইসে সংরক্ষণ করার বিষয়ে বিবেচনা করুন। এই সংবেদনশীল ফাইলগুলো এনক্রিপ্ট করতে ভুলবেন না। আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ হলো এগুলো লুকানোর জন্য একটি ভালো জায়গা খুঁজে বের করা, যাতে আপনাকে গোপনে অনুসরণ করা হলে অথবা আপনি গুপ্তচরবৃত্তির শিকার হয়ে থাকলেও সেগুলো নিরাপদ থাকে। ভালো লুকানোর জায়গা হিসেবে সেফ বা ব্যাংক লকার হতে হবে এমন নয়। আপনি এমন ইউএসবি ডিভাইস ব্যবহার করতে পারেন, যেগুলো এমনই ছোট যে তারা কলম, কানের দুল, ব্রেসলেট বা অনুরূপ বস্তুতে জায়গা করে নিতে পারে। আপনার সংবেদনশীল তথ্যটি কোথায় লুকাবেন, তা বের করতে সৃজনশীল হওয়ার চেষ্টা করুন। শুধু লুকিয়ে রাখার জায়গাটি ভুলে গেলে চলবে না!

ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন অচল করুন

মার্ক জাকারবার্গও তাঁর ল্যাপটপের ক্যামেরায় একটি টেপ লাগিয়ে রাখেন, যেন কোনো ম্যালওয়্যার ব্যবহার করে কেউ প্রতিটি পদক্ষেপ দেখতে না পারে। তৃতীয় কোনো পক্ষের এ রকম নজরদারি এড়ানোর জন্য সহজ উপায় হলো ক্যামেরার ওপর একটি স্টিকার লাগিয়ে রাখা অথবা ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন ফাংশন বন্ধ করে রাখা।

কীভাবে তথ্য মুছে ফেলবেন

যদি আপনি মনে করেন, কেউ আপনাকে অনুসরণ করছে এবং অনুসন্ধানে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টা করছে; তাহলেই কেবল আপনার ডিভাইসের সব ডেটা মুছে দেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করতে পারেন। কাজটি যদি করতেই হয়, তাহলে শুধু ডিভাইসের ডিলিট বা ইরেজ ফাংশনের ওপরই নির্ভর করে থাকবেন না। কারণ, এটি শুধু রেফারেন্সটুকু মুছে ফেলে। কিন্তু আসল নথি তখনো আপনার হার্ড ডিস্কে সঞ্চিত থাকতে পারে এবং সহজেই কোনো তৃতীয় পক্ষ তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। এই কৌশল ফ্ল্যাশ ড্রাইভগুলোর জন্যও একই, যেমনটি ডিজিটাল ক্যামেরায় ব্যবহৃত হয়। সব উপায়ে, আপনার তথ্য ওভাররাইট করুন। এ ক্ষেত্রে উইন্ডোজের জন্য ইরেজার, সিকিউর ইরেজার (Eraser, Secure Eraser) এবং ম্যাকের জন্য সুপার ইরেজার (Super Eraser)-এর মতো টুলগুলো ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়।

ব্যবহারে থাকা তথ্য বা ডেটা ইন মোশন

ব্যবহারে থাকা তথ্য বা 'ডেটা ইন মোশন' বলতে বোঝানো হচ্ছে সেই ধরনের তথ্য, যেগুলো এক নেটওয়ার্ক থেকে আরেক নেটওয়ার্কে যাতায়াত করে। যেমন, ই-মেইল ও টেক্সট মেসেজ। নিম্নলিখিত সুরক্ষা টুলগুলো তথ্য প্রাপকের কাছে পৌঁছানোর আগে সেটাতে তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ এবং তাতে পরিবর্তন ঘটানোর ঝুঁকি এড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।

নিরাপদে ই-মেইল করা

জিমেইল, ইয়াহু বা হটমেইলের মতো প্রচলিত ই-মেইল সেবা ব্যবহার অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য খুব বিপজ্জনক। কারণ, বেশির ভাগ ই-মেইল অ্যাপ্লিকেশনে সুরক্ষা ও গোপনীয়তার মান দুর্বল। এটি মাথায় রাখুন: যে ই-মেইল সেবা প্রতিষ্ঠান যত বড়, সেটি হ্যাকারদের জন্য ততই আকর্ষণীয়। তাই যেকোনো ই-মেইল সেবা ব্যবহার করার আগে সেগুলোতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আছে কি না যাচাই করে দেখুন:

১) সিকিউর সকেটস লেয়ার (এসএসএল) বা

২) ট্রান্সপোর্ট লেয়ার সিকিউরিটি (টিএলএস)

এসব ব্যবস্থা নেই এমন মেইল পরিষেবা ব্যবহার করবেন না। এসএসএল এবং টিএলএস একটি সার্ভার থেকে আরেকটি সার্ভারে আপনার ই-মেইল পাঠাতে অনলাইন ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে এনক্রিপশন নিশ্চিত করে। তবে ই-মেইলটি নন-এনক্রিপ্ট করা সাদামাটা টেক্সট ফাইল হিসেবেই উভয় সার্ভারে জমা হয়। এর অর্থ সার্ভার অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা আপনার ই-মেইলগুলোতে প্রবেশ করতে পারেন, সেগুলো পড়তে বা পরিবর্তন করার সামর্থ্য রাখেন।

পিজিপি একটি অত্যন্ত নিরাপদ সমাধান দেয়। আপনি যদি পিজিপির মাধ্যমে আপনার ই-মেইলগুলো এনক্রিপ্ট করেন, সে ক্ষেত্রে শুধু প্রাপক ছাড়া আর কেউ সেটিতে প্রবেশাধিকার পাবে না। খারাপ খবরটি হলো, এটি প্রয়োগ করা সহজ নয় এবং তাই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় না।

এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পিজিপি হলো একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক সিস্টেম বা সংকেতলিপি ব্যবস্থা, যা দুটি কি বা চাবি তৈরি করে, একটি পাবলিক এবং অন্যটি প্রাইভেট। সরলভাবে ব্যাখ্যা করলে ই-মেইলটি এনক্রিপ্ট করার জন্য পাবলিক কি প্রয়োজন, আর এটি ডিক্রিপ্ট করার জন্য দরকার প্রাইভেট কি। পাবলিক কি, এই নাম থেকেই বোঝা যায়, প্রত্যেকের অ্যাকসেস আছে এটাতে, আর প্রাইভেট কি শুধু ব্যবহারকারীর মালিকানাধীন। আপনি কাউকে পিজিপি-এনক্রিপ্ট করা ই-মেইল পাঠাতে চাইলে ই-মেইল এনক্রিপ্ট করার জন্য তার পিজিপি কি আপনাকে জানতে হবে। আপনি এই কি বা চাবিটি প্রাপকের কাছ থেকে অথবা একটি পাবলিক কি সার্ভার থেকে পাবেন। গ্রহীতা তার প্রাইভেট কি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ই-মেইলটি খুলতে পারবে। পিজিপি ব্যবহার করতে হলে আপনার ই-মেইল ক্লায়েন্টকেও এই সেবার ব্যবহারকারী হতে হবে।

এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ই-মেইল ক্লায়েন্টগুলো হলো থান্ডারবার্ড (Thunderbird) বা জনপ্রিয় মাইক্রোসফট আউটলুক যেগুলোতে পিজিপির জন্য অ্যাড-অন রয়েছে। আপনি চাইলে জিমেইলের মতো ই-মেইল ক্লায়েন্টের পিজিপি ব্যবহার করতে পারেন, সে ক্ষেত্রে মেইলভেলপ (Mailvelope) দিয়ে চেষ্টা করুন। তবে সচেতন থাকতে হবে যে এসব প্রচলিত ই-মেইল সেবার ক্ষেত্রে, পিজিপি প্রেরক, প্রাপক বা ই-মেইলের বিষয়বস্তুকে লুকাতে পারে না। প্রস্তাবিত আরেকটি ই-মেইল সেবার নাম প্রোটনমেইল (ProtonMail) যারা একটি এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্ট সেবা দিয়ে থাকে। এই সেবা একটি জিরো-নলেজ সিস্টেম হিসেবে নকশা করা হয়েছে। ই-মেইলের এবং ব্যবহারকারীর তথ্য সুরক্ষার জন্য গ্রাহকের দিক থেকে এনক্রিপশন ব্যবহার করে এটি করা হয়েছে। তথ্য প্রোটনমেইল সার্ভারে পাঠানোর আগেই এই এনক্রিপশন করা হয়। সার্ভারগুলো তথ্য সুরক্ষিত সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত, এনক্রিপশনটি এসএসএল, পিজিপিভিত্তিক এবং কোডটি ওপেন সোর্স বা মুক্ত উৎস। থান্ডারবার্ড এবং অনুরূপ টুল ইভোলুশনের সঙ্গে প্রোটনমেইলের পার্থক্য হলো, শেষেরটি একটি ই-মেইল সেবাদানকারী এবং শুধু ক্লায়েন্ট নয়।

টেক্সট বা খুদে বার্তার সুরক্ষা

যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বসাম্প্রতিক প্রবণতা হচ্ছে ই-মেইলকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলে এবং হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, ফেসবুক মেসেঞ্জার বা স্ন্যাপচ্যাটের মতো ইনস্ট্যান্ট মেসেঞ্জার বা তাৎক্ষণিক বার্তা বিনিময় পরিষেবার ওপর নির্ভর করা। সেকেন্ডের মধ্যে আপনি বিশ্বজুড়ে তথ্য বা নথি আদান-প্রদান করতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপের মতো সেবাদাতারা তাদের এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনের কথা বলতে পারে; তবে কেউই শতভাগ সুরক্ষার কথা বলতে পারে না। সাধারণত মেসেঞ্জারগুলোর মাধ্যমে গোপনীয় তথ্য আদান-প্রদান বিপজ্জনক। অন্যান্য কিছু টেক্সট মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশন তুলনামূলক সুরক্ষিত এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সেবা দিয়ে থাকে যেমন সিগন্যাল, টেলিগ্রাম বা ওয়্যার, যা আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েড উভয়টিতেই ব্যবহার করা যায়। এই অ্যাপগুলো নিয়ে আরও তথ্য পাবেন এখানে: https://signal.org/, https://telegram.org বা https://wire.com/

পাবলিক ডিভাইস বা গণব্যবহারে থাকা যন্ত্রের সুরক্ষিত ব্যবহার

পাবলিক ডিভাইস বা গণব্যবহারে থাকা যন্ত্রগুলো এড়াতে চেষ্টা করুন। আপনার নিজের ডিভাইস বা যন্ত্র থেকে নিরাপদ যোগাযোগ নিশ্চিত করা সহজতর, এবং আপনি জানেন না আগে কে পাবলিক ডিভাইসটি ব্যবহার করেছিল বা এতে কী ম্যালওয়্যার ইনস্টল করা আছে। আপনার যদি কোনো পাবলিক কম্পিউটার ব্যবহার করতেই হয়, আপনার সঙ্গে একটি বুটেবল ইউএসবি ডিভাইস রাখুন। এই ডিভাইস একটি অস্থায়ী অপারেটিং সিস্টেমের মতো কাজ করবে, যা আপনাকে পাবলিক কম্পিউটারে সেটির নিজস্ব ফাংশন ব্যবহার না করে কাজ করতে দেবে। আধেয়টি র‍্যামে সংরক্ষণ করা হবে, কম্পিউটারের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিতে, এবং শুধু একটি একক সেশনের জন্য তা কাজ করবে। আপনি যখন কম্পিউটার বন্ধ করবেন, পাবলিক ডিভাইসটিতে কোনো ডেটা বা কার্যকলাপ সংরক্ষণ করা থাকবে না।

আপনি ভিন্ন একটি অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতে চাইলে সে ক্ষেত্রেও একটি ডিভাইস থেকে বুট করার পরামর্শ দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি আপনার উইন্ডোজ কম্পিউটারে ইউএসবি স্টিক থেকে বুট করার পরে বুটেবল ইউএসবি ডিভাইসে একটি লিনাক্স সিস্টেম ইনস্টল করে লিনাক্স সিস্টেমে কাজ করতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, আপনার কোনো ডেটা কম্পিউটারে সংরক্ষিত হবে না। একটি বুটেবল ইউএসবি ডিভাইস তৈরি করা অবশ্য সহজ নয়, এবং যদি আপনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে ওয়েবে টিউটোরিয়ালগুলো দেখে নেওয়া উচিত।

ফ্রি ওয়াই-ফাই সংযোগগুলোও এড়ানো উচিত, যেহেতু আপনি জানেন না, একই সংযোগে কারা লগইন করে আছে এবং তারা আদৌ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে কি না। বিনা মূল্যের ওয়াই-ফাইতে সংযুক্ত অবস্থায় ইন্টারনেট সার্ফিংয়ে সর্বদা ভিপিএন ব্যবহার করুন। এটি ন্যূনতম পর্যায়ের গোপনীয়তার সুবিধা দেয়। উইন্ডোজ ১০ অপারেটিং সিস্টেমে কীভাবে একটি ইউএসবি ডিভাইস বুট করাতে হয়, তা দেখতে পারেন এখানে: https://www.youtube.com/watch?v=wzuCgm7dlEc

সুরক্ষার জন্য বিকল্প: লিনাক্স

কম্পিউটার এবং স্মার্টফোনের জন্য লিনাক্স একটি বিকল্প অপারেটিং সিস্টেম, যা বেশির ভাগ কম্পিউটার বিজ্ঞানী ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষজ্ঞরা এটিকে অন্যতম নিরাপদ অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আধুনিক ব্যবস্থাগুলো অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেমের মতো সহজেই ইনস্টল ও ব্যবহার করা যায়। সাধারণ ব্যবস্থাগুলো হলো উবুন্টু, ওপেনএসইউএসই, ডেবিয়ান, মিন্ট এবং এলিমেন্টারি ওএস (Ubuntu, openSUSE, Debian, Mint and Elementary OS)।

লিনাক্সের বিশেষ সুবিধাটি হলো, এটি বিনা মূল্যে পাওয়া যায়, ওপেন সোর্স এবং প্রয়োজনমতো কনফিগার করা যায়। সোর্স কোড ত্রুটি চিহ্নিত করা এবং নিরাপত্তা বাগগুলো দূর করতে যেহেতু যে কেউ সহায়তা করতে পারে, তাই অন্য যেকোনো অপারেটিং সিস্টেমের তুলনায় লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে সেগুলো দ্রুত উন্মোচন করা যায় এবং সেগুলো ঠিক করা হয়। এবং লিনাক্স সিস্টেমটি যেহেতু উইন্ডোজ বা অ্যাপলের মতো এতটা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত নয়, সেহেতু লিনাক্স প্ল্যাটফর্মে ভাইরাস আছে কম। প্রতিবছর, লিনাক্স তাদের সেরা লিনাক্স বিতরণ তালিকা প্রকাশ করে।

র‍্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে নিরাপদ বলে বিবেচিত, ইউএসবি ডিভাইসের জন্যেও ব্যবহার করা যায়:
@ tails.boum.org

সেরা ডিজাইন ইন্টারফেস:
@ elementary.io

জনপ্রিয় এবং ল্যাপটপের জন্য ভালো:
@ ubuntu.com

ব্যবহারকারী-বান্ধব:
@ opensuse.org
@ linuxmint.com

সার্ভারের জন্য ভালো:
@ debian.org

কীভাবে একটি সুরক্ষিত ফোনকল করবেন

সব সময় গোপনীয় তথ্যের বিষয়ে আলাপ করতে সূত্রের সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলার চেষ্টা করুন। টেলিফোনের কথোপকথন তৃতীয় পক্ষ সহজেই শুনে ফেলতে পারে, তাই যেকোনো মূল্যে গোপনীয় আলাপ এড়িয়ে চলুন। স্কাইপের মতো জনপ্রিয় পরিষেবাগুলো এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন বা দুই প্রান্তের সুরক্ষিত যোগাযোগের নিশ্চয়তা দেয় না। এমনকি হোয়াটসঅ্যাপ, ওয়ার বা সিগন্যাল এনক্রিপ্ট ফোনের মতো টুলও দুটি ডিভাইসের মধ্যে কথোপকথনের ক্ষেত্রে শতভাগ সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে না।

আপনার উৎসের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করার পর বাড়িতে ফোন রেখে যান অথবা সেটি বন্ধ করুন এবং ডিভাইসটি অফলাইন রয়েছে, তা নিশ্চিত করতে ব্যাটারিটি খুলে নিন। পাশাপাশি আপনি একটি ফ্যারাডে কেজ ফোন কেস ব্যবহার করতে পারেন, যা বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় সংকেতগুলোকে বাধা দেয়। উইকিলিকসের হুইসেলব্লোয়ারের নাম অনুসারে এটিকে ডাকা হয় 'এডওয়ার্ড স্নোডেন পদ্ধতি'। এখানে একটি কথোপকথনের গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে ডিভাইসটি রেফ্রিজারেটরে রেখে দেওয়া হয়।

এ ছাড়া আপনার ফোনে অ্যাপ্লিকেশন সীমিত করতে পারেন। প্রতিবার যখন আপনি একটি অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করেন, সেটি আপনার ডিভাইসের নির্দিষ্ট ফাংশন, ডেটা বা তথ্যে অ্যাকসেস বা প্রবেশের অনুমতি চায়। বাইরের অনেক সোর্সের কাছ থেকে তখন আপনার ডেটা অরক্ষিত হয়ে পড়ে। কেমব্রিজ অ্যানালিটিকা কেলেঙ্কারির কথাই চিন্তা করুন। খুবই নিরীহ একটি অ্যাপ থেকেও কীভাবে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে লাখো মানুষের তথ্য। এবং সেগুলো এমন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে হয়তো কেউই সম্মতি দিত না। তাই আপনার যদি কোনো অ্যাপ ইনস্টল করতে হয়, তাহলে আপনার ডিভাইসে তাদের প্রবেশের অনুমতি সীমাবদ্ধ করে দেওয়া উচিত। তবে এটিও মনে রাখবেন, অ্যাকসেসের অনুমতি ছাড়া অ্যাপ্লিকেশন কাজ করবে না।

> বেশ কিছু ব্যাখ্যামূলক ভিডিওর লিংক এবং সুরক্ষাসংক্রান্ত আরও তথ্য পাওয়া যাবে এই লিংকে: investigative-manual.org
>
> !

সংক্ষেপে, এই অধ্যায়ের লক্ষ্য ছিল একটি সুরক্ষিত কাজের পরিবেশের গুরুত্বকে বোঝানো এবং স্পষ্ট করা যে, কখনোই একটি অনুসন্ধানী কাজের ক্ষেত্রে শতভাগ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়তো সম্ভব হবে না। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করা হবে: কীভাবে আপনার অনুসন্ধানকে সাজাবেন, সাক্ষাৎকারে সূত্রদের যথাযথ প্রশ্ন করবেন এবং আপনার দরকারি তথ্যটি বের করে আনার জন্য কোন সাক্ষাৎকার-কৌশল সবচেয়ে ভালো।

নোট

অধ্যায় ৫

গবেষণা, গবেষণা, গবেষণা

কাজ শুরুর জন্য একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কিছু প্রাথমিক গবেষণা দক্ষতা থাকতে হয়। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সাজানো, নথিপত্রের সূত্র ধরে খোঁজাখুঁজি এবং কম্পিউটার-নির্ভর প্রতিবেদন—এমন নানা ধরনের কৌশল ও টুলের ব্যবহার সম্পর্কেও তাঁদের জানতে হয়। এই অধ্যায়ে মূলত এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সংখ্যার হিসাব-নিকাশ করার মৌলিক দক্ষতাও এখন অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য জরুরি হয়ে গেছে। কারণ, কিছু প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে।

অনেক দেশেই দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন, সন্ত্রাস দমন আইন কিংবা স্রেফ সরকারি কর্মকর্তাদের অনীহার কারণে সরকারি-বেসরকারি খাতের নানা তথ্য জনগণের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে যায়। সরকার কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ভর্তুকি দিচ্ছে, এ নিয়ে স্বচ্ছতার দাবি জোরালো হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৭ সালে ইউরোপের কয়েকটি দেশ তথ্য প্রকাশের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে। তা-ও এই পর্যায়ে পৌঁছাতে সময় লেগেছিল সাত বছর। ভর্তুকির টাকা কোন ব্যবসায় যাচ্ছে, সেই তথ্য প্রকাশ করতেও ২০০০ থেকে ২০০৭ সাল, অর্থাৎ সাত বছর সময় নিয়েছে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ। এই তথ্য পেতে সেখানকার ছয়টি দেশের সাংবাদিকেরা জোটবদ্ধ হয়ে আদালতে মামলা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ভর্তুকির গন্তব্য ইউরোপের জনগণকে জানানো। এই আইনি লড়াইয়ের ফলটাও ছিল মহামূল্য: সরকারগুলো তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয় এবং সেখানে দেখা যায়, রাষ্ট্রীয় সেসব ভর্তুকি মূলত গেছে বড় বড় শিল্পপতি আর রাজপরিবারগুলোর কয়েকজন সদস্যের পকেটে। কোটি কোটি পাউন্ড আর ইউরো ভর্তুকি দিয়ে তাঁদের এমনিতেই লাভজনক ব্যবসাকে আরও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ক্ষুদ্র বা টিকে থাকার সংগ্রামে মরিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো তেমন কিছুই পায়নি।

আপনি যদি এমন কোনো দেশে থাকেন, যেখানে তথ্য অধিকার আইন নেই, উল্টো পদে পদে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা আইনের বাধা আছে, তাহলে আপনাকে অনেক লড়াই করতে হবে। হয়তো সরকারি কর্মকর্তারা আপনাকে কোনো নথি দিতে দেরি করতে পারে। কিংবা অবস্থা আরও খারাপ হলে, আপনাকে টাকা দিয়ে সেটি নিতে হতে পারে। টাকা ছাড়া নথি পাওয়ার আর কোনো উপায় না থাকলে আপনি কীই-বা করতে পারেন। দীর্ঘ, কঠিন পথটা হলো তথ্য অধিকার আইনের জন্য লড়াই করা এবং সেটি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য পাওয়া।

আপনার দেশে যদি তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার (রাইট টু ইনফরমেশন– আরটিআই) আইন থাকে, তাহলে নিম্নোক্ত সাধারণ ধাপগুলো অনুসরণ করে তথ্য পেতে পারেন:

- বিষয়বস্তুর ওপর আধা সরকারি বা বিশেষ কিছু প্রকাশ করা হয়েছে কি না, তা খুঁজে বের করুন এবং এমন কাউকে খুঁজে বের করুন, যিনি সংশ্লিষ্ট নথি পেতে বা দেখতে আপনার সহায়তা করবেন।
- সব সময় যাচাই করে নিন, তথ্যটি এরই মধ্যে প্রকাশ হয়ে গেছে কি না। সীমিত আকারে বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশিত সংবাদপত্রেও মাঝেমধ্যে গোপন নথিপত্রের সারাংশ বা হুবহু অংশ ছাপা হয়।
- সর্বশেষ পদক্ষেপ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করুন। আপনি যদি দেখাতে পারেন যে সব ধরনের বিকল্প আপনি চেষ্টা করেছেন, তাহলে নথি পেতে আপনার দাবি আরও জোরদার হবে।
- আগেভাগে পরিকল্পনা করুন: আরটিআই প্রক্রিয়াটি ধীর হতে পারে, এবং এই আইনের আশ্রয় নেওয়ার মানে এটা নয় যে আপনি আগামীকালই নথি পেয়ে যাবেন। কাজেই সঠিক তথ্য কার কাছে রয়েছে, তাঁকে চিহ্নিত করুন এবং তাঁর কাছে যান।
- যথাযথ নথি পেতে বিষয়ের নাম বা সংখ্যাগত পরিচিতি উল্লেখ করে অনুরোধ করুন। 'যা আছে সব দিন'– এই ধরনের আবেদন করলে অগ্রাহ্য বা দেরি করার অজুহাত পেয়ে যান কর্মকর্তারাও।
- আপনার অনুরোধ এবং যে জবাব পেয়েছেন, তা খুব যত্নের সঙ্গে নথিবদ্ধ করুন। সেগুলো আপনার কাজে লাগতে পারে এটি প্রমাণের জন্য যে, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্য অধিকার আইন লঙ্ঘন করছে এবং হয়তো কিছু গোপন করতে চাইছে।

নিজের ডেটাবেস কীভাবে গড়ে তুলবেন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সব সময় বুঝতে চায়, সিস্টেম বা ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে, অথবা কীভাবে তার কাজ করার কথা। এ জন্য আপনার যে ধরনের তথ্য দরকার, তা বিবেচনায় নিন। আপনার প্রশ্নগুলো এভাবে সাজান:

এই প্রক্রিয়া বা সিস্টেম কীভাবে কাজ করার কথা

কার, কখন এবং কীভাবে কাজ করার কথা ছিল

প্রক্রিয়াটি কীভাবে নথিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করা হচ্ছে

প্রক্রিয়ায় কী ধরনের মানদণ্ড থাকতে হবে, কীভাবে তা নিশ্চিত করা হবে এবং কে নিশ্চিত করবেন

গবেষণা, গবেষণা, গবেষণা

জবাবগুলো যতটা বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ হবে, ততই আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন, কোথায় এবং কখন গলদ হচ্ছে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার পাশাপাশি, আপনার অনুসন্ধানে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। এটি মাথায় রেখে কাজ করলে আপনার তথ্য, ফাইলপত্র খুব ভালোভাবে গুছিয়ে রাখা সহজ হবে। যেন প্রতিবেদন লেখার সময় সবকিছু খুঁজে পেতে আপনার সময় বেশি না লাগে, বা কিছু ভুলে যাওয়ার মতো অবস্থা না হয়।

হাতে থাকা কেসের জন্য টাইমলাইন তৈরি

অনুসন্ধানের ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে এই নয় যে আপনাকে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে; বরং কখন, কোন তথ্যটি পাওয়া গেল, তার ধারাবাহিক কালক্রম বজায় রাখতে হবে। তাহলে আপনি কোনটির পর কী হয়েছে এবং যুগপৎভাবে কী হয়েছে, তার একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরতে পারবেন।

আপনাকে জ্ঞানের গুণগত ও পরিমাণগত পার্থক্যও করতে হবে

পরিমাণগত দিকটা হলো বিভিন্ন সংখ্যাগত হিসাব। ধরা যাক, একটি ওষুধের ক্ষেত্রে কতগুলো গুণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া উচিত। জলাশয়ে দূষণের মাত্রা কত। বিগত পাঁচ বছরে শহরে অপরাধের হার কী পরিমাণে বেড়েছে। প্রায়শই সংখ্যার হিসাবে অকাট্য প্রমাণ থাকার কারণে স্থানীয় একটি সংবাদ জাতীয় পর্যায়ে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন আপনার এলাকায় বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার হয়তো পুরো দেশেরই চিত্রের প্রতিফলন করতে পারে।

বিশ্বের বহু জায়গায়ই পরিমাণগত বা লিখিত নথি পাওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, এমন নথি হয়তো থাকেই না। তবে নথিপত্রের ঘাটতি রয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে কোনো একটি বিষয়ে অনুসন্ধানের আরও দুটি উপায় রয়েছে: নিজস্ব পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর পরিকল্পিত সাক্ষাৎকার। সাধারণ মানুষ, ঘটনা, যুক্তি, উদ্দেশ্য, অনুভূতি ও তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদিকে বিবেচনা করা হয় কোয়ালিটেটিভ ডেটা হিসেবে। মনে রাখতে হবে, যেকোনো একটি বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করলে তা আপনাকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যেমন ছোট একটি জমির দলিল বা ঠিকানা আপনাকে ওই জমির মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় জরিপ: যে খবর এড়িয়ে যাওয়া কঠিন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য গ্রামের কাগজ স্থানীয় পাঠকদের কাছে অনেক দিন ধরেই জনপ্রিয়। সম্প্রতি পত্রিকাটির একটি অনুসন্ধানী সিরিজ গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বেশ আলোচিত হয়। সেটি টাকার অঙ্কে বড় কোনো দুর্নীতি, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা বা কোম্পানি নিয়ে নয়। তাদের প্রতিবেদনের বিষয় ছিল একটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সার্বিক অব্যবস্থাপনা, যে কারণে গ্রামের হাজারো দরিদ্র মা সরকারের দেওয়া মাতৃত্বকালীন ভাতা থেকে বঞ্চিত হন।

স্থানীয় দৈনিক হিসেবে যশোরের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে গ্রামের কাগজের যোগাযোগ বরাবরই ভালো। অনেক দিন ধরেই তাদের অফিসে অভিযোগ আসছিল, মাতৃত্বকালীন ভাতার সুবিধাভোগীদের বেশির ভাগই ভুয়া অর্থাৎ যাঁরা ভাতা পাচ্ছেন, তাঁদের একটা বড় অংশই আসলে মা নন। কয়েকটি উপজেলা থেকে একই রকমের অভিযোগ আসার পর তাঁরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেন।

প্রাথমিকভাবে 'মিথ্যে মা' শিরোনামটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল পত্রিকাটির সম্পাদকের কাছে। এর সঙ্গে গভীর জনস্বার্থ এবং ক্ষমতা ও সরকারি তহবিলের অপব্যবহারের মতো উপকরণ থাকায় তাঁরা মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি নিয়ে অনুসন্ধানে নামার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তখনো তাঁরা জানতেন না, এই অনুসন্ধান গোটা ভাতা বিতরণব্যবস্থার মধ্যে নিহিত গভীর এক সমস্যাকে উন্মোচন করতে যাচ্ছে।

গ্রামের কাগজের অনুসন্ধান শুরু হয় তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে কর্মসূচির দরকারি তথ্য ও নথিপত্র চেয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসে আবেদনের মাধ্যমে। তারা যশোরের জেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে এই কর্মসূচির সুবিধাভোগীর থানাভিত্তিক তালিকা চেয়ে আবেদন করে। কিছুদিনের মধ্যেই প্রায় সাড়ে সাত হাজার সুবিধাভোগী এবং তাদের নাম, ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় নথিপত্র তাদের হাতে আসে। 'শুরুটা ভালোই ছিল', বলেন গ্রামের কাগজের সম্পাদক মবিনুল ইসলাম। 'কিন্তু তখনো আমাদের ধারণা ছিল না সামনে কী হতে যাচ্ছে এবং অনুসন্ধানটি শেষ করতে আসলে কত সময় লাগবে।'

স্থানীয় পর্যায়ে, সাধারণত সাংবাদিকেরা যখন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে হওয়া অনিয়ম বা দুর্নীতি নিয়ে রিপোর্ট করেন, তখন সেই অনিয়মকে 'ব্যতিক্রম' বলে উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায় কর্তৃপক্ষের মধ্যে। তখন গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানী দলের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দেয়, ঠিক কত সাক্ষাৎকার বা তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করলে বিষয়টির ব্যাপকতা বোঝানো যাবে। এবার তাঁরা এমন একটি প্রতিবেদন করতে চাইছিলেন, যা কেউ 'বিচ্ছিন্ন ঘটনা' বলে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

সমাধানের জন্য তাঁরা শরণাপন্ন হন গবেষক মোস্তাফিজুর রহমানের, যিনি বর্তমানে রেসিন্ট নামের একটি বহুজাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রিসার্চ ম্যানেজার। তাঁর উত্তর ছিল সহজ, 'একটা জরিপ করে ফেলেন'। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে দ্বিধা ছিল পত্রিকাটির প্রতিবেদকদের। অনেকেই প্রশ্ন করেন, প্রথাগত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে জরিপের কৌশলকে তাঁরা কীভাবে মেলাবেন। তখন মোস্তাফিজুর রহমান বলেছিলেন, 'এ জন্য একটি মেথডোলজি (গবেষণা পদ্ধতি) দরকার, আর কিছু নয়।'

এরপর গ্রামের কাগজ দলের সঙ্গে মিলে একটি কার্যকর গবেষণা পদ্ধতি তৈরির কাজে হাত দেন মোস্তাফিজ। ধারণাটি ছিল এ রকম: রিপোর্টাররা তাঁদের অন্য সব অনুসন্ধানের মতোই সাংবাদিকসুলভ সাক্ষাৎকার নেবেন এবং ছবি, ভিডিও, নথিপত্রসহ দরকারি প্রমাণ সংগ্রহ করে আনবেন। কিন্তু জরিপের অংশ হিসেবে সাক্ষাৎকারের সময় তাঁরা প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন অবশ্যই করবেন। সেই সব প্রশ্নের উত্তর একটি স্প্রেডশিটে লিপিবদ্ধ করা হবে বিশ্লেষণের জন্য।

'ধরুন, আপনার হাতে ৫০টি কার্ড আছে। আপনি চোখ বন্ধ করে সেখান থেকে একটি বেছে নিলেন। তারপর অন্ধের মতো আরও একটি বেছে নিলেন। এভাবে নিতেই থাকলেন যতক্ষণ না আপনার স্যাম্পল সাইজে পৌঁছাচ্ছেন। গবেষণায় এটাই র‍্যানডম মেথড, যা একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঠিক করা যায়', এভাবেই সুবিধাভোগী বাছাইয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন এই সামাজিক জরিপ বিশেষজ্ঞ।

পরিসংখ্যানের একটি সূত্র ব্যবহার করে নির্ধারিত হয়, গোটা যশোরে সাড়ে ৭ হাজার সুবিধাভোগীর মধ্য থেকে ৩৮৪ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হলে সেটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরবে। 'এই সংখ্যাকে রাউন্ড করে স্যাম্পল সাইজ ৪০০ ঠিক করা হয়'– বলেন মোস্তাফিজ। এরপর যশোর জেলাকে আটটি প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত করে, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিটি উপজেলায় কতজন মায়ের সাক্ষাৎকার নিতে হবে, সেই নমুনার সংখ্যা ভাগ করে নেওয়া হয়।

একটিমাত্র অনুসন্ধানের জন্য ৪০০ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া গ্রামের কাগজের জন্য বেশ কঠিন ছিল। কারণ, তাদের প্রতিবেদকের সংখ্যা মাত্র ১৮ জন। তাঁদের প্রতিবেদন দিয়েই প্রতিদিনের পত্রিকা ছাপা হয়। কিন্তু পিছপা হননি সম্পাদক। তিনি বলেন, 'রিপোর্টারদের মধ্যে এই কাজ নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ ছিল। আমরা রিপোর্টারদের আটটি দলে ভাগ করলাম। প্রতি দলে দুজন সদস্য ছিলেন। একেক দলের দায়িত্ব ছিল একেক উপজেলায়। ঠিক হলো, একেক দিন একেক দল সাক্ষাৎকারের জন্য বের হবে।'

এই অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সাক্ষাৎকারের পাশাপাশি অসংখ্য ছবি, ভিডিও এবং অন্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে দলটি। এরপরের ধাপ ছিল, তাদের আনা তথ্যকে একটি স্প্রেডশিটে নথিবদ্ধ করা। কিন্তু এর আগে তাদের কেউই মাইক্রোসফট এক্সেলে এত বেশি ডেটা নিয়ে কাজ করেনি। এবারও তাদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন মোস্তাফিজ।

'তাদেরকে গবেষণা পদ্ধতি এবং সঠিকভাবে ডেটা সংগ্রহের কাজে প্রশিক্ষিত করে তোলা বেশ চ্যালেঞ্জিং কাজ ছিল'– বলেন তিনি। 'কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, তথ্য সঠিক কি না, কীভাবে যাচাই করতে হবে– এসব বিষয় নিয়ে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেছি। তাঁরা সফলভাবে কাজটি শেষ করতে পেরেছেন তাঁদের সত্য বের করে আনার সহজাত ক্ষমতার মাধ্যমে।'

কিন্তু ডেটা থেকে যে চিত্র বেরিয়ে এল, তা রীতিমতো অপ্রত্যাশিত ছিল গ্রামের কাগজের অনুসন্ধানী দলের জন্য। দেখা গেল, তারা প্রাথমিক যে অনুমান নিয়ে অনুসন্ধানে নেমেছিল, সেটি ভুল! তাদের জরিপে 'নকল মা' খুব একটা পাওয়া যায়নি। মায়েরা আসল, কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই দরিদ্র নন এবং ভাতাভোগী পরিবারের এক-তৃতীয়াংশই গ্রামীণ সমাজকাঠামোর বিচারে রীতিমতো ধনী।

সমাজে দরিদ্রদের মধ্যেও যারা দরিদ্র, তাদের জন্যই সরকারের এই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। কিন্তু ডেটা বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, মায়েদের ৯২ শতাংশই নীতিমালায় দেওয়া শর্ত অনুযায়ী দরিদ্র নন। তারা দেখল, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বা রাজনৈতিক দলের নেতারা স্বজনপ্রীতি বা ঘুষের বিনিময়ে ভাতাভোগী নির্বাচন করছেন। এই জরিপ ফলাফল থেকে ভুয়া স্বাস্থ্যসনদ, তদারকিতে নিযুক্ত নামসর্বস্ব এনজিও, ভুয়া সইয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, সভাবিহীন কমিটিসহ একাধিক নতুন প্রতিবেদন জন্ম দিল।

দেখা গেল, অনেক মা-ই জানেন না ভাতাভোগী হিসেবে তাঁদের আবেদনের সঙ্গে স্বাস্থ্যসনদ জমা দেওয়া হয়েছে; কোনো ভাতাভোগীই এক বছরে তাঁদের ঘরে কোনো এনজিওর প্রতিনিধি আসতে দেখেননি; অনেকেই মনে করতে পারেননি, তাঁরা ব্যাংকে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন এবং স্থানীয় কমিটিতে ভাতাভোগী প্রতিনিধি থাকা বাধ্যতামূলক হলেও কেউই কোনো সভায় ডাক পাননি।

ডেটা বা উপাত্ত যখন নতুন নতুন স্টোরির দিকে নিয়ে গেল গ্রামের কাগজ দলকে, তখন আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন দেখা দিল। এবার তারা কমিটির সভার বিবরণী, তদারকিতে নিয়োজিত এনজিওর তালিকা এবং ভাতাভোগীদের আবেদনের সঙ্গে জমা দেওয়া দলিলসহ দরকারি সব নথির জন্য আবেদন করল তথ্য অধিকার আইনে।

তারপর সেই আটটি দল আবার অনুসন্ধানে গেল মাঠে। কিন্তু এবার তারা জানে কী স্টোরি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে, কাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনবে এবং অভিযোগ প্রমাণের জন্য আর কোন কোন দলিল সংগ্রহ করবে। এই দফায় তারা অভিযুক্ত রাজনীতিক ও কর্মকর্তাদের শনাক্ত করে তাঁদের বক্তব্য সংগ্রহ করল, ঠিকানা ধরে প্রতিটি এনজিওর অফিসে গিয়ে অস্তিত্বহীন বা নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রমাণ পেল এবং এমনও একটি ঘটনার সন্ধান পেল, যেখানে মাতৃত্বকালীন ভাতার টাকা জমা হয়েছে একজন পুরুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বরে গ্রামের কাগজ পত্রিকা মাতৃত্বকালীন ভাতা নিয়ে তাদের এই অনুসন্ধানী ধারাবাহিক প্রকাশ করে। এতে ১০টির বেশি প্রতিবেদন ছিল। সেখানে তুলে ধরা হয় দুর্বল ও অকার্যকর নীতিমালার সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি মিলে, কীভাবে দরিদ্র মায়েদের সামাজিক নিরাপত্তাবলয়ে আনার মহৎ উদ্যোগকে কলুষিত করছে। একই সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর, এনজিও এবং জনপ্রতিনিধিদেরও জবাবদিহির আওতায় আনে।

এই ধারাবাহিক প্রকাশের পর যশোরের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ব্যাপক সাড়া আসতে থাকে। গ্রামের মানুষেরা কখনো টেলিফোনে, কখনোবা সশরীরে এসে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অনিয়মের তথ্য দিতে থাকেন। এর মধ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষও গোটা কর্মসূচিতে সুবিধাভোগী বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনার ঘোষণা দেয়।

পত্রিকাটির সম্পাদক বলেন, 'মানসিকতায় এই পরিবর্তন এসেছে। কারণ, অনুসন্ধানের ফলাফলকে কেউ বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে উড়িয়ে দিতে পারেননি। জরিপের উপাত্ত যে সত্য তুলে ধরেছে, তাকে চ্যালেঞ্জ করা যায়নি।'

এই লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইটে। সম্পাদনা করে এখানে পুনপ্রকাশ করা হলো।

গবেষণাকে গুছিয়ে রাখা

অনুসন্ধানলব্ধ সব তথ্য সুসংগঠিত করতে কিছু ইলেকট্রনিক প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টুলস রয়েছে, যা সাক্ষাৎকার, যোগাযোগের তথ্য, তথ্যদাতা ও তাঁদের দক্ষতার জায়গাগুলো নিয়ে ডেটাবেস তৈরিতে আপনার সহায়ক হবে। এতে প্রশ্নের তালিকা, ঘটনা বা তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে প্রমাণিত তথ্য ও প্রমাণের অপেক্ষায় থাকা ধারণা বা সম্ভাব্য বিষয় এবং নথি-সংশ্লিষ্ট হাইপারলিংক, পরিসংখ্যান, তথ্যভান্ডার, সারমর্ম এবং সাক্ষাৎকার সংরক্ষিত হবে। সাংবাদিকদের মধ্যে এভারনোট (Evernote) খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু এটি গোপন তথ্য সংরক্ষণের জন্য ততটা নিরাপদ নয়। ব্যবস্থাপনা টুল বাছাইয়ের আগে তার নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে।

গোছানো সাক্ষাৎকার নেওয়া

গোছানো/কাঠামোগত সাক্ষাৎকার অনেকটা ছোটখাটো জরিপের মতো। আনুষ্ঠানিক কাগজপত্রের অনুপস্থিতিতে এভাবেই আপনি গোছানো উপায়ে ডেটা তৈরি করে নিতে পারেন। এ জন্য আপনার প্রয়োজন হবে সাধারণ কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নের তালিকা। যেখান থেকে আপনি কিছু কোয়ানটিটেটিভ ডেটা পাবেন বলে আশা করতে পারেন। যদিও আপনাকে সব সময়ই তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করতে পারতে হবে। কখনো কোনো ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় বাড়তি কিছু প্রশ্নও জুড়ে দিতে হতে পারে।

১. এমন একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশ্নতালিকা তৈরি করুন, যাতে সম্ভাব্য সত্য তথ্যগুলো উঠে আসবে। যেমন: সূত্রকে জিজ্ঞেস করুন, প্রথমবার কখন এ রকম ঘটনা ঘটেছিল, তা তিনি মনে করতে পারেন কি না। এই উপায়ে সমস্যাটা কখন থেকে শুরু হলো, তা আপনি জানতে পারবেন (উদাহরণস্বরূপ, ধর্ষণ বা হামলা, ফসলহানি, সড়কের ক্ষতি, গুম), এর সম্ভাব্য কারণ (যেমন তিনি বলতে পারেন যে ঘটনার সময় 'ক'ও সেখানে ছিল), এবং অন্যদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল (যেমন আমরা 'এক্স' শহরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম)।

২. সব তথ্যদাতাকে একই ধরনের প্রশ্ন করুন।

৩. প্রশ্নগুলো যথাযথভাবে করুন, সুনির্দিষ্টভাবে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করুন এবং উত্তরগুলো যথাযথভাবে নথিবদ্ধ করুন। এটি এমন এক ধরনের সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, যেখানে ক্লোজ এন্ডেড, অর্থাৎ যথাযথ জবাব পেতে হ্যাঁ বা না সূচক এক শব্দেই উত্তর হয়– এমন ধরনের প্রশ্ন বেশ কাজে লাগে। যদিও আপনাকে খোলামেলা ও সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া পাওয়ার চেষ্টাও করতে হবে। সামষ্টিকভাবে এসব জবাব আপনার নিজস্ব তথ্যভান্ডার তৈরিতে কাজে আসবে।

পেপার ট্রেইল

নথি অনুসরণ বা পেপার ট্রেইল থেকেও আপনার তথ্যভান্ডারে আরও তথ্য যোগ হতে পারে। হাইপোথিসিস সমর্থনের জন্য কী ধরনের নথিপত্র লাগবে এবং সেগুলো কীভাবে পাওয়া যাবে, তা নির্ধারণের জন্য একটি কৌশল তৈরি করতে হবে আপনাকে। এই প্রক্রিয়ায় আপনি একটি নথি দিয়ে শুরু করে, সেখান থেকে পরবর্তী প্রাসঙ্গিক নথির খোঁজ পাবেন। এরপর নথিগুলো বিশ্লেষণ করে আপনার পাওয়া তথ্যের সঙ্গে তার যোগসূত্র মেলাতে হবে।

এসব প্রাথমিক নথিতে যা আপনার কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয় সবকিছু চিহ্নিত করুন। উদাহরণত এতে এমন কোনো ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত থাকতে পারে, যিনি গৃহযুদ্ধকবলিত একটি এলাকায় কোনো খনিতে নিরাপত্তা কর্মকর্তা ছিলেন (সংঘাত অর্থায়নে হীরার অবৈধ বাণিজ্যের জন্য যে এলাকা পরিচিত)। জীবনবৃত্তান্তে ওই ব্যক্তির চাকরিজীবনের ফাঁকফোকরগুলোর কথা না-ও থাকতে পারে। এখানেই মৌলিক গাণিতিক দক্ষতার বিষয়টি আসে। তাঁর কর্মজীবনে বিভিন্ন জায়গায় কাজের সময়গুলো যোগ করলেই তাঁর কর্মজীবনের পুরো সময়ের হিসাবে কোনো ফাঁক রয়েছে কি না, কোনো একটা সময়ের চাকরির কোনো রেকর্ড না থাকলে তা ধরা পড়বে। আপনি যদি কোনো কাজ বা প্রতিষ্ঠানের রেকর্ড যাচাই করেন, তাহলে জানতে পারবেন, কোনো ব্যক্তি হঠাৎ করেই চাকরি ছেড়ে গিয়েছিলেন কি না। এর মাধ্যমে ওই ব্যক্তির কর্মস্থলের ইতিহাস জানতে আরও নথি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। আপনি হয়তো জানতে পারবেন যে মানবসম্পদ বিভাগে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরি বা প্রতারণার অভিযোগ নথিবদ্ধ হয়েছিল। এরপর ওই ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল কি না, তাঁকে আদালতে তোলা হয়েছিল কি না কিংবা কারাদণ্ড হয়েছিল কি না, সেই সব নথিরও প্রয়োজন পড়তে পারে। অন্য কথায়, এক নথি থেকে আপনার অন্য নথির প্রয়োজন পড়তে পারে এবং এর মাধ্যমে প্রমাণযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক নথিগুলো আলাদা করে ফেলার পর নিজেকে অনুসন্ধানের কেন্দ্রীয় চরিত্রের জায়গায় বসান। চিন্তা করুন, তাঁর পক্ষে কী কী করা সম্ভব ছিল। তিনি একটির বদলে অন্য পথটি বেছে নিলে ভিন্ন কিছু হতো কি না। এভাবে ভাবলে অন্ধকারে পথ হাতড়ানো থেকে রক্ষা পাবেন। তথ্যের জন্য লাইব্রেরি বা আর্কাইভের ওপর নির্ভর করা একটি দীর্ঘ, ক্লান্তিকর প্রক্রিয়া। বিষয়টি ছোট করে দেখবেন না। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য যদি ডিজিটাল ভার্সনে থাকে, তাহলে সেটির জন্য সার্চ করলে প্রাসঙ্গিক ফল যেমন আসবে, একই পরিমাণ অপ্রাসঙ্গিক ফলও আসবে। আর আপনি যদি এমন দেশে থাকেন, যেখানে উন্মুক্ত নথিগুলো প্রধানত কাগজপত্রে আছে; তাহলে আপনাকে হয়তো লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে এগুলো দেখার জন্য; এবং খুঁজে বের করতে হবে– কীভাবে নথিপত্রগুলো সাজানো আছে।

প্রায় ক্ষেত্রেই জন্মসনদ কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো সরকারি নথির খোঁজ করাই কাজ শুরুর সেরা উপায় বলে দেখা যায়। তবে এগুলো পেতে বেশ সময় লাগে এবং সেটি খুব বেশি কাজেও আসে না; বিশেষ করে যদি তথ্যটি অনলাইনেই পাওয়া যায়। স্থানীয় পত্রিকাগুলোর অনলাইন আর্কাইভে সার্চ করে দেখুন, কোনো ব্যক্তির ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়া বা তার কর্মস্থলের ওয়েবসাইটে খোঁজ করুন। দেখুন, এসব জায়গা থেকে কী তথ্য পাওয়া যায়। আপনার কাছে যদি সেই ব্যক্তির সত্যিকার পুরো নাম থাকে, তাহলে হয়তো আপনি আদালতের মামলার মতো নথিপত্রেও তার নাম

পেয়ে যেতে পারেন। তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন এবং কোথায় কোথায় তার সংযোগ আছে ইত্যাদি বিষয়েও আপনি নানা তথ্য পেয়ে যেতে পারেন। সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকেও আপনি বিপুল পরিমাণ তথ্য পেয়ে যেতে পারেন, যা আপনাকে নথিপত্রের সন্ধানে তাড়িত করবে। যেমন স্থানীয় কোনো ভবনের বিস্তারিত তথ্য (ব্যাংক, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সরকারি কার্যালয়), আইনি কোনো নোটিশ (যেমন দানপত্র, নাম পরিবর্তন, বিয়ে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, বন্ধকি সম্পত্তির দখল, নিলাম, টেন্ডার, জব্দ/পরিত্যক্ত সম্পত্তি ইত্যাদি) এবং গ্রেপ্তার ও আদালতের রায়। প্রতিটি তথ্যই আপনি যে ধাঁধার সমাধান খুঁজছেন, তার ছোট ছোট জবাব হাজির করতে পারে।

সারকথা হলো, আপনি নথির সন্ধান করবেন এভাবে:

- ইন্টারনেটে সার্চ, আর্কাইভে অনুসন্ধান এবং তথ্য দিতে পারেন এমন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত ছুটুন, যতক্ষণ না অনুসন্ধানের কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তি সম্পর্কে পর্যাপ্ত নথি পাওয়া যায়।
- ডেটা ম্যাপিং কৌশল ব্যবহার করে তথ্যগুলোকে এমনভাবে সাজান, যাতে তথ্য বিশ্লেষণ করে ফাঁকফোকর, বৈপরীত্য ও অসংগতিগুলো বের করা যায়।
- কোন কোন নথি পেলে এসব ফাঁকের জবাব পাওয়া যাবে বা বৈপরীত্যগুলোর ব্যাখ্যা মিলবে, সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তা এবং সে অনুযায়ী অনুসন্ধান শুরু করুন।

ডিজিটাল অনুসন্ধান

ইন্টারনেটের কল্যাণে প্রতিবেদকদের জন্য তথ্যপ্রাপ্তি, এবং সেই তথ্যকে সাজানো, পুনরুদ্ধার ও বিশ্লেষণের সুযোগ বেড়ে গেছে নাটকীয়ভাবে। কয়েকটি সুপরিচিত সার্চ প্রোগ্রামের মধ্যে আছে ডাকডাকগো (DuckDuckGo) এবং মেটা-ক্রলার্স (meta-crawlers), যারা একই সঙ্গে চার-পাঁচটি সার্চ ইঞ্জিনে অনুসন্ধান চালাতে পারে। ওয়েবে কার্যকর অনুসন্ধানের কৌশল হলো, গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (কি-ওয়ার্ড) ও বাক্যাংশ নির্বাচন। এগুলো হতে হবে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, যাতে সার্চ ফলাফলে অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বাদ পড়ে। সেরা ফলের জন্য আপনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী সার্চকে সাজিয়ে নিতে পারেন। ডাকডাকগোতে আপনি চাইলে সময়, অঞ্চল এবং ভাষা নির্বাচন অথবা নিজস্ব অনুসন্ধান কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

সার্চের ব্যাপকতা কমাতে নির্বাচিত শব্দ বা কি-ওয়ার্ড ব্যবহার একটি সহজ কৌশল। তবে প্রায় সময়ই শুধু কি-ওয়ার্ড যথেষ্ট হয় না। ধরা যাক, আপনি জন স্মিথ নামে কোনো ব্যক্তির তথ্য খুঁজছেন। সার্চ ইঞ্জিনে কেবল তাঁর নাম লিখে অনুসন্ধান করলে আপনার সামনে হাজির হবে এই দুটি শব্দ আছে এমন প্রতিটি ফলাফল। এই নামসংশ্লিষ্ট লাখ লাখ রেকর্ড পাওয়া যাবে। অপ্রয়োজনীয় তথ্যের স্তূপে তলিয়ে যাওয়া এড়াতে কাঙ্ক্ষিত জন স্মিথের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন, তাঁর বসবাসের জায়গা বা তাঁর পেশা লিখে অনুসন্ধান করতে হবে। ইন্টারনেটে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আপনি যদি স্ক্রিনশট ব্যবহারের পরিকল্পনা করে থাকেন, তাহলে তা নেওয়ার আগে খোলা ট্যাবগুলো বন্ধ করে দেওয়ার কথা সব সময়ই মনে রাখতে হবে। সেখান থেকে স্পর্শকাতর তথ্য অপসারণ করতে হবে, না হলে আপনার স্ক্রিনশটে ওই সব তথ্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে।

কাঠামোবদ্ধ এবং সহজে অনুসন্ধান করা যায়, এমন কৌশলে নিজের তথ্যভান্ডার তৈরি করা ভালো। যখন আপনি ইন্টারনেট থেকে নথি নিয়ে সংরক্ষণ করবেন কিংবা সাক্ষাৎকার বা কোনো নোট সংরক্ষণ করবেন, এগুলো এমনভাবে সাজাতে হবে যেন পরে তা আবার সহজে খুঁজে পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে কিছু প্রকল্প ব্যবস্থাপনা টুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

সবশেষে বিবেচনায় রাখতে হবে এই নৈতিক বিষয়গুলো:

- ! যদি সম্ভব হয়, বিস্তারিত তথ্যসূত্র বা মূল ওয়েবসাইটের লিংক প্রকাশ করুন; অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য ও তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন।
- ! সাবধানতার সঙ্গে তথ্য যাচাই করুন, বিশেষ করে তথ্যটির তারিখ।
- ! পরিসংখ্যানগত ও সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের ব্যাপারে সঠিক উপসংহারে পৌঁছান; আপনার পাঠক হয়তো গণনার কাজটি করতে পারবেন না এবং আপনার অঙ্কের ওপরই তাঁদের ভরসা করতে হবে।

অনুসন্ধান ও গবেষণার কিছু কৌশল পাওয়া যাবে এখানে: http://researchclinic.net
বা এখানে: https://www.youtube.com/watch?v=R0DQfwc72PM

ডেটা সংগ্রহ

সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজিরের জন্য ডেটা সংগ্রহই সম্ভবত সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়া। কোন সূত্র অনুসরণ করলে আপনি সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারবেন, সেটা আপনাকে ভেবে দেখতে হবে। যেমন, একটি হাসপাতালে নার্সদের চুরির ব্যাপারে হাসপাতালে ভর্তি কোনো একজন রোগীর অভিযোগ, নাকি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গের শুনানি ও বরখাস্ত হওয়ার রেকর্ড সংবলিত ডেটাবেস? আপনাকে মাথায় রাখতে হবে– সব তথ্যের মতো পরিসংখ্যানেও কারচুপি বা বিকৃতি থাকতে পারে এবং তার ওপর ভিত্তি করে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হতে পারে। তবে ডেটাবেসের তথ্য কার্যকরভাবে সংগ্রহ করার মাধ্যমে গত দশকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর বেরিয়েছে।

আন্তর্জাতিক ডেটা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ফল দিতে পারে। যেমন উন্নয়ন সহযোগী দাতারা প্রতিবছরই তাদের খরচ করা অর্থের বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দাতাদের ভান্ডার থেকে আপনার দেশের জন্য প্রযোজ্য ডেটা সংগ্রহ করে নিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করতে পারেন। এখান থেকে 'সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণেই বেশির ভাগ অর্থ ব্যয় করেছে দাতারা'– এমন শিরোনামের প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন।

ডেটা মাইনিং যে সব সময় কেবল আর্থিক বিষয়াদি নিয়েই হতে হবে, এমন নয়। সামাজিক নেটওয়ার্কের তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক, রাজনৈতিক দলের সমর্থক এবং বিশেষ কোনো সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধনী ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিবেদনও তৈরি হয়েছে। এসব নেটওয়ার্ক হতে পারে কোনো সুনির্দিষ্ট পেশার, ভৌগোলিক গোষ্ঠীর সদস্যদের অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতাদের। তাঁদের আয়, তাঁরা কাদের সঙ্গে কাজ ও সাক্ষাৎ করেন, সেসবের তথ্য একত্র করতে পারেন আপনি, যা একটি সামাজিক নেটওয়ার্কের চিত্র তুলে ধরে, যা সমাজে তাঁদের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা দেবে।

সব সময়ই যে আপনাকে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে, এমনও নয়। সাংবাদিক ও বিভিন্ন সংগঠন অনেক সময় নানা ডেটাবেস তৈরি ও প্রকাশ করে। এগুলোকেও আপনার গবেষণার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এসব ডেটাবেসে প্রবন্ধ, গবেষণা এবং যোগাযোগের তথ্যও থাকে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেন্দ্রগুলোও বিভিন্ন ডেটাবেস তৈরি করেছে সবার ব্যবহারের জন্য। ঘরের আরও কাছে, সিঙ্গাপুরের সরকার তার কিছু ডেটা অনলাইনে তুলে দিয়েছে সবার দেখার জন্য।

> যেমন, গুয়ানতানামো বে কারাগারের বন্দীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে সেই ডেটাবেস সবার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের Nicar। সেগুলো পাওয়া যাবে এখানে:
>
> www.ire.org/nicar

সংখ্যা নিয়ে করণীয়

বেশির ভাগ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা গুণগত হয়। কেন ও কীভাবে অনিয়ম হয়েছে এবং কারা দায়ী হতে পারে, সেসবের খোঁজ পাওয়া যায় এ ধরনের প্রতিবেদনে। তবে তাতে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যও থাকে। যেমন: ঘাটতি কত বড়; আপনার দেশে অবৈধ মাছ শিকারের পরিসংখ্যান কী; স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে প্রতিবছর কতজন রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এর অর্থ, ছোট থেকে বড় সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য কীভাবে উপস্থাপন করতে হয়, তা আপনাকে জানতে হবে। সেই সঙ্গে জানতে হবে খুব সাধারণ কিছু গণনার মাধ্যমে শতকরা হারে সংখ্যার উপস্থাপনকে কীভাবে গুরুত্ববহ করে তুলতে হয়। সংখ্যাকে ভালোবাসার কারণেই যে বেশির ভাগ মানুষ সাংবাদিক হন, তা নয়। তবে সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্য জটিল কিছু নয়। বাস্তবতা হলো, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এটি জরুরি।

আপনি মৌলিক তথ্য বোঝার মাধ্যমে কাজটা শুরু করবেন। যেমন, আপনি যদি কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নার্সের দাপ্তরিক কাজের বিবরণ ও কর্মদক্ষতা যাচাই করতে চান, তাহলে একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারেন। তিনি আপনাকে এই পেশার কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনের একটি কালক্রম তৈরি করে দিতে পারবেন। এরপর পর্যবেক্ষণ ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আপনি আরও যেসব প্রশ্ন খুঁজে পেতে পারেন:

- কোন কাজে সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হয়? নার্সরা কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে বিকল্প কিছু করেন কি না? সেই বিকল্পগুলো কী? নার্সদের ওপর কি কর্মঘণ্টার মধ্যে অনেক বেশি দায়িত্ব পালনের চাপ সামলাতে হয়?
- কতজন রোগীকে সেবা দিতে হবে, তার সঙ্গে একজন নার্সের কাজের বিবরণের সম্পর্ক কীভাবে নিরূপণ করা হয়? একজন রোগীকে সেবা দিতে কত সময় লাগে?

একইভাবে, আপনার যদি বাতাসের নমুনার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়, তাহলে বাতাসে দূষণ সৃষ্টিকারী কী কী উপাদান রয়েছে, তা জেনে নিয়ে আপনি একজন চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন, এসব উপাদান বিপজ্জনক কি না এবং বাতাসে এগুলোর মাত্রা কত হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। নিজের দেশের নিরাপদ বায়ুবিষয়ক আইনকানুন ও নীতিমালার সঙ্গে বাতাসে থাকা উপাদানের মাত্রা তুলনা করুন। আপনি হয়তো তখন জানতে পারবেন, এ সমস্যা শুরু হয়েছে অনেক আগে এবং এরপর পরিস্থিতি খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। অথবা জানতে পারেন, এ ধরনের দূষণজনিত সমস্যা প্রায়শ ঘটছে অথবা বাতাসে এগুলোর মাত্রা আগে যতটা থাকত, এখন তার চেয়ে কম। সাংবাদিকের কাজ হলো এসব সংখ্যার ব্যাখ্যা দেওয়া এবং ঠিক কখন থেকে এ সমস্যা বড় হয়ে উঠল বা সবার নজরে এল, তা তুলে ধরা। তবে সংখ্যাই সব কথা নয়। এখন কেন এ সমস্যা লক্ষণীয় হয়ে উঠল, সে পটভূমিটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং হয়তো সেটাই আপনার প্রতিবেদনের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে।

বেশির ভাগ দেশে আবহাওয়া পরিসংখ্যান হলো সবচেয়ে বড় সংখ্যাগত রেকর্ডের অন্যতম। যেমন, আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক যুগে কর্তৃপক্ষ তথ্যের প্রথম যে সংগ্রহ গড়ে তুলেছিল, তার মধ্যে আবহাওয়ার পরিসংখ্যান একটি। এমনকি সমাজে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ইতিহাস থেকে ওই সময়েরও আগে বন্যা ও খরার তথ্য পাওয়া যায়। এশিয়ার অনেক দেশেই আবহাওয়ার তথ্যসংবলিত ডেটাবেস

রয়েছে, যেখানে আবহাওয়ার ধরনবিষয়ক নথি পাওয়া যাবে। হয়তো আপনার দেশে ঘটে চলা জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা ও খরা আসলেই অভূতপূর্ব কি না, তা জানতে অনুসন্ধান করতে চাইবেন। এ ক্ষেত্রে আপনি আবহাওয়া পরিবর্তনের প্রবণতাবিষয়ক তথ্যগুলো তুলনা ও বিশ্লেষণ করতে পারেন।

এটি আমাদের নিয়ে যায় আরেকটি জায়গায়: ডেটা প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে। আর এখান থেকে আপনি নতুন নতুন ধারণা পেতে পারেন। যেমন, সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে থাকা পরিসংখ্যান কেউ খুব একটা যাচাই করে না। যাঁরা সেটি লিখছেন, তাঁরাও আশা করেন না কেউ প্রশ্ন তুলবে। কিন্তু সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রায়ই আলোড়ন সৃষ্টিকারী সব প্রতিবেদনের জন্ম দেয়। ভালো অনুসন্ধানী সাংবাদিকেরা কোনো সম্ভাব্য খবরের সূত্রই হাতছাড়া করেন না। একই সঙ্গে সংখ্যা, রেখাচিত্র এবং/অথবা সংখ্যাতাত্ত্বিক অন্যান্য তথ্যের ক্ষেত্রে সন্দেহপ্রবণ হওয়া উচিত। প্রথম দেখায় মনে হতে পারে, এই ডেটাগুলো দিয়ে দারুণ একটি মৌলিক প্রতিবেদন তৈরি করা যাবে। কিন্তু ভালো অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের এসব পরিসংখ্যানের উৎস ভালোভাবে জানার চেষ্টা করা উচিত। যেমন, জরিপটা কীভাবে চালানো হলো, নমুনাগুলো কীভাবে সংগ্রহ করা হলো, কে অর্থায়ন করেছে, কে প্রকাশ করেছে, কিংবা সেটি প্রকাশকারীরা নিজেদের স্বার্থে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দিয়েছে কি না।

প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ: শুধু সংখ্যা দিয়ে কোনো অর্থ তৈরি হয় না। সাংবাদিক হিসেবে, ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনি সেখানে অর্থ যোগ করেন।

নমুনা ও তুলনা

শুধু সংখ্যা আপনাকে খুব সামান্যই তথ্য দেয়। পুরো জনগোষ্ঠীর যে অংশের মধ্য থেকে তথ্য তুলে আনা হয়েছে, সেটির নানা রকম অর্থ হতে পারে। 'পাঁচজন চিকিৎসকের মধ্যে চারজন' শুনতে হয়তো ভালোই লাগবে। কিন্তু যুক্তরাজ্যের কয়েক হাজার চিকিৎসকের মধ্যে মাত্র ২০ জনের মধ্য থেকে তুলে আনা এই ফলাফলে যে ১৬ জন চিকিৎসককে ভিন্নভাবে চিত্রিত করা হলো, তা মোটেও প্রতিনিধিত্বশীল নয়। পুরো দেশের সব চিকিৎসক কী চিন্তা করছেন বা কেমন আচরণ করেন, তা এই তথ্যে উপস্থাপিত হয় না।

একটি প্রতিনিধিত্বমূলক জরিপের আরও অনেক নির্ণায়ক থাকে। চিকিৎসকের উদাহরণের ক্ষেত্রে বলা যায়, সাংবাদিকদের দেখা উচিত:

- দেশজুড়ে বিভিন্নজনের মতামত পেতে বিভিন্ন শহরে বা হাসপাতালে এই জরিপ চালানো হয়েছে কি না
- জরিপ চালাতে কোন উপায় ব্যবহার করা হয়েছে– টেলিফোন, অনলাইন নাকি মুখোমুখি সাক্ষাৎকার
- নির্বাচিত জরিপ পদ্ধতিটি কীভাবে অংশগ্রহণকারীদের উত্তর প্রভাবিত করেছে
- সব লিঙ্গের, সব বয়সের চিকিৎসকের মতামত কি এতে উঠে এসেছে

এগুলো কিছু উদাহরণমাত্র। জরিপের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন করার সময় সাংবাদিকেরা কোন মানদণ্ড বিবেচনা করবেন, তা নির্ধারিত হবে জরিপের বিষয় ও ফলাফলের ভিত্তিতে।

রেখাচিত্র

চিত্র ও রেখাচিত্র ব্যাখ্যায় সব সময়ই শীর্ষ বা চূড়ার দিকে তাকান। রেখাচিত্রের ক্ষেত্রে আপনাকে মাত্রা আর শুরুর জায়গাটা বুঝতে হবে। পরিবর্তন যে অংশে দৃশ্যমান, শুধু সেই অংশটিতেই আলোকপাত করার মাধ্যমে পরিমাপকের মাত্রা বাড়িয়ে তাকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা যায়। রেখাচিত্র বিশ্লেষণের সময় শতকরা হিসাবের ব্যাপারে ভালো করে যাচাই করতে হবে। আগের নমুনা ও তুলনার তথ্যের কথা মাথায় রাখতে হবে।

কখনো কখনো পরিসংখ্যানের দুটি গুচ্ছ বা সেট একই ধরনের প্রবণতা তুলে ধরে। এর মানে এই নয় যে তারা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা দুটির মধ্যে কারণ ও প্রভাবসংশ্লিষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরা বড় হয়। একই হারে বাড়ে তাদের ভাষার দক্ষতাও। তার মানে এই নয় যে শারীরিক বৃদ্ধিই তাদের ভাষার দক্ষতা বাড়ায়! আবারও বলছি, আপনাকে রেখাচিত্র ও চার্ট ভালোভাবে পর্যালোচনা করে বোঝাতে হবে, কেন এগুলোর মধ্যে যোগসূত্রের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের সম্পর্ক প্রমাণে এ বিষয়ে একই ধরনের গ্রহণযোগ্য গবেষণা আছে কি না। একইভাবে একটির পর আরেকটি ঘটনা ঘটা মানেই তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রমাণিত হয়ে যাওয়া নয় যে, প্রথম ঘটনার কারণেই দ্বিতীয়টি ঘটেছে। কেবল পরিসংখ্যান দিয়েই কোনো কিছু প্রমাণ সম্ভব নয়। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক পটভূমির বিষয়ে গবেষণা ও অনুসন্ধান প্রয়োজন। এতে অন্যান্য সম্ভাব্য কারণকে বাদ দিতে দিতে আপনি সেই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিটি শনাক্ত করতে পারবেন, যার কারণে প্রথম ঘটনাটির পর দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে।

ডেটার প্রেক্ষাপট অনুসন্ধানের সময় খোঁজ করুন: কোন প্রতিষ্ঠান এই জরিপ করিয়েছে এবং এখানে তাদের কোনো নির্দিষ্ট স্বার্থ জড়িত আছে কি না। ই-সিগারেটের ওপর পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল বার্তা সংস্থা রয়টার্স। পরীক্ষাটি চালিয়েছিল ফিলিপ মরিস ইন্টারন্যাশনাল। কোম্পানিটি এমন একটি সিগারেট তৈরি করতে চেয়েছিল, যা কফির চেয়েও কম ক্ষতিকর। রয়টার্সের এই প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, কীভাবে এ রকম একটি গবেষণার ফলাফল ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের করা জরিপ-গবেষণা নিয়েও সংশয়ী হতে হবে। কারণ, কোনো কোনো বিভাগ এসব গবেষণার জন্য অনুদানের ওপর নির্ভর করে এবং সেই অনুদানের পেছনে কারও স্বার্থ জড়িয়ে থাকতে পারে।

এতক্ষণে আপনি সব ধরনের তথ্য জোগাড় করে ফেলেছেন, সম্ভাব্য সূত্র বা তথ্যদাতাদের নাম জেনেছেন, এবং একটি ডেটাবেসও তৈরি করেছেন। পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে ভালো ব্যক্তিসূত্র চিহ্নিত করা এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য বের করার কৌশল।

অধ্যায় ৬

৬

যেভাবে পাবেন ভেতরের খবর

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সবচেয়ে বড় সম্পদগুলোর একটি, ব্যক্তিসূত্র বা মানুষ। যদি কেউ তথ্যদাতার সঙ্গে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে তিনি সবার আগে পেয়ে যেতে পারেন বড় কোনো খবর। এই অধ্যায়ে এ ধরনের সম্পর্ক কীভাবে গড়ে তোলা যায় এবং তথ্যদাতার বিশ্বাস কীভাবে অর্জন করা যায়, যাতে তাঁরা তথ্য দিতে রাজি হন, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার একটি অংশ হচ্ছে কোনো বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং প্রতারকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারা। অপর অংশটি হচ্ছে তদবিরকারী ও কোনো বিষয় বা ঘটনাকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতে উৎসুক মুখপাত্রকে চিনতে পারা, যাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সাংবাদিকদের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

কীভাবে ভালো সোর্স বা তথ্যদাতা চিহ্নিত করা যায়

একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য সোর্স খুঁজে বের করা, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক গড়া এবং তা ধরে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য ও স্পষ্ট সোর্স হন তাঁরাই, যাঁরা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, সরাসরি জড়িত অথবা কোনো না কোনোভাবে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। আপনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এমন লোকজনের নামের তালিকা থেকে প্রত্যক্ষদর্শী খুঁজে নিতে পারেন, এবং আপনি নিজে যদি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকেন, তাহলে সেখানে থাকা অন্য মানুষদের সঙ্গে কথা বলুন। যে যেমন দাবিই করুন না কেন, সবকিছুই যাচাই করে নিতে হবে। যদি দেখা যায়, কেউ সত্যি কথা বলেছেন; তাহলে তাঁর বক্তব্যটি আপনার অনুসন্ধানের জন্য অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্র হয়ে উঠবে। এটিও ভুলে যাবেন না যে, আপনি যদি এমন কিছু নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন, যার অভিজ্ঞতা আপনার নিজেরও আছে; তাহলে আপনি নিজেও একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষদর্শী। প্রতিটি প্রতিবেদন আপনার নেটওয়ার্ক বাড়াবে। এটি প্রতিবেদন করতে করতে আপনা-আপনিই তা হয়ে যায়। কিন্তু আপনি যদি আবাসনস্বল্পতা বা সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে স্বজনপ্রীতির মতো নির্দিষ্ট কোনো প্রজেক্ট বা বিষয় নিয়ে কাজ করেন, তাহলে আপনাকে খুবই প্রাসঙ্গিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রের একটি নেটওয়ার্ক সতর্কভাবে গড়ে তুলতে হবে। সহকর্মী সাংবাদিকদের উপেক্ষা করবেন না; তাঁদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ অনেক সময় মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। অবশ্যই সেটি নির্ভর করবে আপনার কর্মস্থল বা প্রতিবেদনটি নিয়ে প্রতিযোগিতার ওপর। আপনি বিস্তারিত বলবেন কি না, তা নিয়ে সতর্ক হতে পারেন। আপনার প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে খোলাখুলিভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন লোকজনেরও খোঁজ করতে পারেন। স্পোর্টস ক্লাব, ধর্মীয় সংগঠন বা দাতব্য সংস্থার মতো সংগঠনের কথা বিবেচনা করতে পারেন। মনে রাখতে হবে, কারও সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে কিছু সাক্ষাৎকারদাতা হয়তো সেই ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতে পারেন। আপনার অনুসন্ধানে বিষয়টি মাথায় রাখুন। অভীষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে অতীতে যাঁদের সম্পর্ক ছিল, তাঁদের সন্ধান করুন। যেমন: সাবেক ব্যবসায়িক অংশীদার, সাবেক স্বামী বা স্ত্রী, সাবেক কর্মী, চিকিৎসক, শিক্ষক অথবা সাবেক পুলিশ বা সেনা কর্মকর্তা। যে ব্যক্তির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে দ্বন্দ্ব আছে বা ছিল কিংবা মামলা রয়েছে, এমন লোকজনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ সোর্স হতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, তাঁদের আবেগ-অনুভূতি ও মনোভাবের কারণে তাঁদের তথ্যে অতিরঞ্জন বা রং চড়ানো হয়ে থাকতে পারে।

সোর্সের মূল্যায়ন

মানুষ নানা কারণে সাংবাদিকদের তথ্য দেয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সাহায্য করা বা কোনো অনিয়ম উদ্‌ঘাটনের মতো মহৎ উদ্দেশ্য সেখানে থাকে না। আপনি যখন কোনো সোর্সের কাছে তথ্য চাইতে যাবেন, সেখানেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্যক্তিগত ক্ষোভ, পরিস্থিতি বা বিশ্বাসের কারণে তাঁরা রং চড়িয়ে কথা বলতে পারেন, ফলে তাঁদের দেওয়া তথ্যে অতিরঞ্জন হতে পারে, কিংবা কোনো বিষয় তাঁরা ইচ্ছা করেও চেপে যেতে পারেন। কোনো কোনো সোর্স হতে পারে অতি-উৎসাহী। (কী ঘটেছে তার বদলে) আপনি যা শুনতে পছন্দ করবেন, তাঁরা সেটাই বলবেন। তাই সোর্সের অতীত সম্পর্কে একটু জেনে নিতে পারলে এমন অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে; কথা বলার সময় তাঁরা কেমন আচরণ করছেন, তা পর্যবেক্ষণও আপনাকে অনেক কিছু বুঝতে সাহায্য করবে।

মানুষ কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃত ভুল করে বসে এবং ঘটনার বিস্তারিত ভুলে যায়। এই দুই কারণে সব তথ্য তৃতীয় একটি নিরপেক্ষ বা স্বাধীন সূত্র থেকে আপনার যাচাই করে নেওয়া উচিত। ভাষ্য হুবহু না মিললেও দুটি ভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া তথ্যপ্রমাণ একই দিকে নির্দেশ করার কথা। আপনি যদি দ্বিতীয় কোনো তথ্যদাতা খুঁজে না পান, অথবা যাচাই করার সময় হাতে না থাকে, তা-ও পাঠক-দর্শকদের জানানো উচিত। তাঁদের বলুন, কেন এই তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু মনে রাখুন: একটি প্রতিবেদনে অনেক বেশি অসমর্থিত তথ্য, দাবি আর অভিযোগ থাকলে তা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে আপনার অবস্থানও দুর্বল করে দেয়।

তবে ধরা যাক, আপনার দ্বিতীয় তথ্যদাতা সাংঘর্ষিক তথ্য দিয়েছেন, তাহলে? এ ক্ষেত্রে পাঠককে উভয় তথ্যদাতার তথ্য জানাতে হবে, প্রতিবেদনের মধ্যে উভয় ভাষ্যকেই জায়গা দিতে হবে। যেমন: 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, সশস্ত্র ব্যক্তিরা সীমান্তে অনুপ্রবেশ করেছে; তবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সীমান্ত অতিক্রমকারীদের নিরস্ত্র বলে বর্ণনা করেছে।' আপনি যে খবর দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তাতে খাপ খায় না এমন তথ্য আপনি স্রেফ এড়িয়ে যেতে পারেন না। এই দ্বন্দ্বগুলো আপনার প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক হলে তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। সিমুর হার্শের মতো সফল ও বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্কের অধিকারী সাংবাদিকেরা কখনো কখনো একটি সূত্রের ভিত্তিতেও প্রতিবেদন করেছেন। তবে এমন সাংবাদিকের সংখ্যা খুবই কম।

আপনি যাঁর সঙ্গেই কথা বলুন না কেন, একদম শুরুতেই তথ্যদাতা নিজের যে পরিচয় দিচ্ছেন, তার যথার্থতা যাচাই করে নিন। নিজেদের কর্মস্থল, ঠিকানা, পরিবারের বিস্তারিত, সামরিক বাহিনীতে কাজ করে থাকলে তার রেকর্ড, পাসপোর্ট, পরিচয়পত্র বা ড্রাইভিং লাইসেন্স এগুলো কি তাঁরা দেখাতে পারবেন? কোনো তথ্যদাতার যদি অপরাধ, ব্যক্তিগত দুর্দশা, মানসিক অসুস্থতা, আর্থিক সমস্যা, সহিংসতা বা প্রতারণার অতীত ইতিহাস থাকে, তাহলে আপনাকে অবশ্যই তাঁর দেওয়া তথ্যের বিষয়ে সন্দিহান হতে হবে। কোনো তথ্যদাতা যদি এসব বিষয়ে জানাতে বা কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে তার পেছনে জোরালো কোনো কারণ থাকাই স্বাভাবিক এবং এ ক্ষেত্রে আপনাকে বিচার করতে হবে যে তাঁর দেওয়া তথ্য আপনি বিশ্বাস করবেন কি না।

আপনি কিসের সন্ধান করছেন, সেটা যদি নিশ্চিত হতে পারেন, কেবল তখনই আপনি কী পেলেন, তার গুণগত মান নিশ্চিত করতে পারবেন। তথ্যদাতা কি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা অথবা একগুচ্ছ প্রমাণ হাজির করেছেন? আপনি কি এগুলো বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে সম্ভাব্য অন্য সব রকমভাবে সাজালে ভিন্ন উপসংহারে পৌঁছান? তাহলে 'ফাঁকটা' কোথায়? তথ্যদাতার অভিজ্ঞতা কি তাঁর জনগোষ্ঠী বা সমাজের প্রতিনিধিত্বমূলক? এটি কি হালনাগাদ, অথবা ঘটনাটি কি অনেক আগে ঘটেছিল যে পরিস্থিতি এখন বদলে যেতে পারে এবং ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ভুলভাবে স্মরণ করছেন?

বিশেষজ্ঞ

প্রায় সব বিষয়েই বিশেষজ্ঞ রয়েছেন: ইতিহাসবিদ, বিজ্ঞান গবেষক, আইনবিদ, প্রকৌশলীসহ অন্যান্য। বাণিজ্যিক বিষয়াদি (যেমন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম) নিয়ে কাজ করার সময় সঠিক বিশেষজ্ঞ চিহ্নিত করা বিশেষভাবে জরুরি। তিনি হতে পারেন এমন কেউ, যিনি ওই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। এ ধরনের বিশেষজ্ঞ আপনার অনুসন্ধানে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে ওই বিশেষজ্ঞ কীভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং যে বিষয়ে আপনি অনুসন্ধান শুরু করেছেন, তার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন কি না, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাও আপনার সামনে হয়তো পরিপূর্ণ একটি চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম। যেমন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মানবাধিকারকর্মীর মতোই একজন আইনজীবী, একজন পুলিশ কর্মকর্তা, একজন চিকিৎসক কিংবা একজন জিজ্ঞাসাবাদকারীও বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারেন।

তবে সব বিশেষজ্ঞই একই মানের কিংবা একই রকম নির্ভরযোগ্য নন। কাজেই এ ক্ষেত্রে আপনার বিশ্বস্ত অন্য সাংবাদিকদের পরামর্শ নিন, তাঁদের কর্মকাণ্ড ও যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজখবর করুন। জানার চেষ্টা করুন, কাদের জন্য তাঁরা গবেষণাটি করেছেন। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের টাকায় যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরাও তদবিরকারীদের মতো হতে পারেন। তাঁদের কাজের কারণে কী কী বিতর্ক বা সমালোচনা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা করুন। এমনকি নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞের (অথবা বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন) সম্পর্কেও প্রশ্ন করা প্রয়োজন। যদি বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ একমত না হতে পারেন, তাহলে ভিন্নমতগুলো একসঙ্গে উপস্থাপনের উপায় খুঁজে বের করতে হবে আপনাকে, যেগুলো থেকে পাঠক একটা ধারণা পেতে পারেন। আর যদি বিশেষজ্ঞদের মতামত একদিকেই যায়, তাহলে তাঁদের পরামর্শ আপনি গ্রহণ করতে পারেন। তবে এরপরও আপনি ভুল প্রমাণিত হতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা যখন সমানভাবে বিভক্ত, তখন তা পাঠকের কাছে ব্যাখ্যা করা আপনার দায়িত্ব। তবে আবারও বলছি, আপনাকে অবশ্যই এসব বিশেষজ্ঞের কর্মকাণ্ড ও যোগ্যতা সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর করতে হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিয়ে সংবাদমাধ্যম দীর্ঘদিন ধরে এমনভাবে সংবাদ পরিবেশন করে চলেছে, যাতে মনে হয় বিশেষজ্ঞরা সমানভাবে বিভক্ত। কিন্তু পরে যখন প্রতিবেদনগুলো বিশ্লেষণ করা হলো, তখন জানা গেল যে অনেক 'বিশেষজ্ঞই' জ্বালানি খাতের মুখপাত্র হিসেবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিষয়টি নাকচ করে গেছেন। বাস্তবতা হলো, বহু বছর ধরে বিজ্ঞানসম্মত অনেক প্রমাণ মিলেছে যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটছে এবং তা বিপজ্জনক।

সরকারি বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদেরও খুব ভালোভাবে পর্যালোচনা করুন এবং সন্দেহ নিয়ে দেখুন। অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতো সরকার নিয়োজিত বিশেষজ্ঞও ভুল বা সঠিক হতে পারেন। কখনো কখনো তাঁরা সরকারের চাপে বিশেষভাবেও তথ্য উপস্থাপন করেন। বিশেষজ্ঞ নয়, এমন তথ্যদাতার দেওয়া তথ্য যেভাবে যাচাই করা হয়, এই বিশেষজ্ঞদের দেওয়া তথ্যও সেভাবে দ্বিতীয় সূত্রের তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। সরকারি দপ্তরের কোনো বিশেষজ্ঞের কাছে অনানুষ্ঠানিকভাবেও জানতে চাওয়ার সুযোগ রয়েছে। এতে হয়তো প্রতিবেদনে সূত্র হিসেবে তাঁর পরিচয় উল্লেখ করতে পারবেন না, কিন্তু আপনি অনেক তথ্য পেয়ে যেতে পারেন।

আমরা মনে করি, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো শুধু লিখিত প্রতিবেদন ও নীতিমালার উৎস। কিন্তু তারা যে দেশে তাদের সদর দপ্তর এবং যেসব দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়, এমন সব জায়গায় দরকারি যোগাযোগের সূত্রও দিতে পারে। আপনাকে সহযোগিতা করতে তারা বাধ্য নয়। কিন্তু যথাযথভাবে যোগাযোগ করতে পারলে, বিশেষত অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর বিষয়ে তাদের যদি জোরালো আগ্রহ থাকে, তাহলে প্রায়শই এসব সংস্থা সহানুভূতি দেখায়। গবেষণার মাধ্যমে আপনি তাদের মন্তব্য ও তথ্যের পটভূমি পাবেন, কিন্তু ভারসাম্যের প্রয়োজনে আপনাকে অন্য কোনো উৎস থেকেও সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা ভাবতে হবে।

কখনো কখনো আপনি নিজের কাজের বিষয়বস্তু বা আপনার সুনির্দিষ্ট তথ্যের কথা জানিয়েও সূত্রের সন্ধান করতে পারেন। আপনি এ কাজ অনানুষ্ঠানিকভাবে, নেটওয়ার্কে থাকা সূত্রদের কাজে লাগাতে পারেন; কখনো কখনো অনুসন্ধানের বিষয়বস্তুর ওপর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারেন। সে ক্ষেত্রে অনেকেই হয়তো আপনাকে ই-মেইলে বা টুইটের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাতে পারেন। অথবা আগে তথ্য দিতে রাজি হননি এমন সূত্র আপনার প্রতিবেদন 'শুধরে' দিতে আগ্রহী হতে পারেন। ভালো-মন্দ; সব দিক বিবেচনা করেই আপনাকে কৌশল ঠিক করতে হবে। কারণ, কখনো কখনো এমন পদ্ধতিতে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আপনি যাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে চান, তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারে এবং তথ্যপ্রমাণ নষ্ট বা লুকানোর চেষ্টা করতে পারে, তথ্যদাতাদের মুখ বন্ধ কিংবা আপনার বিরুদ্ধে আগাম কোনো পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারে!

প্রতিবেদনের জন্য বিশেষজ্ঞ খুঁজে না পাওয়ার অর্থ এই নয় যে আপনি আর অগ্রসর হতে পারবেন না। আপনি ভুল হতে পারেন, অথবা হয়তো ভুল বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে থাকতে পারেন, কিংবা আপনার প্রশ্নটা ভুল হতে পারে। প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের মত থাকলে তাতে মুক্তমনেরই প্রকাশ ঘটবে এবং তা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অন্য বিশেষজ্ঞদের এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করতে পারে।

হুইসেলব্লোয়ার, গেটকিপার এবং ডোর-ওপেনার

কখনো কখনো আপনি হয়তো নথিপত্র পড়তে গিয়েই 'তথ্য ফাঁসকারী' বা হুইসেলব্লোয়ারের (অসন্তুষ্ট কর্মী, যিনি নিজের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে তথ্য দিতে চান) সন্ধান পেয়ে যাবেন। উন্নত বিশ্বে অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও সরকারি দপ্তরে অনানুষ্ঠানিক ইলেকট্রনিক বৈঠক 'কক্ষ' রয়েছে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও তথ্য আদান-প্রদান হয়। তবে এসব সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য সরাসরি আপনার প্রতিবেদনে ব্যবহার করবেন না। আপনাকে আগে নিশ্চিত হতে হবে যে তথ্য ফাঁসকারীর অস্তিত্ব আছে বা তিনি সত্যিই কর্মরতদের একজন এবং তিনি তাঁর দাবি প্রমাণ করতে পারবেন। তাঁর দেওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণের বিষয়ে নিশ্চিত হতে সূত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার চেষ্টা করুন।

সবচেয়ে দরকারি সূত্র তাঁরাই, যাঁরা আপনাকে নৈতিকতার পরীক্ষায় ফেলবেন না এবং আপনাকে 'আত্মপরিচয় গোপন' করে সেই প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে ঢোকার ঝুঁকির মুখে ফেলবেন না। প্রকৃতপক্ষে তথ্যের গেটকিপার বা দ্বাররক্ষীরা হলেন: ব্যক্তিগত সহকারী, অভ্যর্থনাকক্ষের কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মকর্তারা, যাঁরা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে আপনাকে ঢুকতে দেবেন অথবা সেখানে কাদের যাতায়াত, সে সম্পর্কে বলতে পারবেন। শুধু উচ্চপদস্থদের মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ভুল করবেন না; সবার সঙ্গে ভালো পেশাদারি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করুন। দ্বাররক্ষীরা শুধু সশরীরে প্রবেশই নয়, তথ্যও নিয়ন্ত্রণ করেন। মনে রাখতে হবে, ব্যাংক, ঋণদাতা অথবা সরকারি দপ্তরের কর্মীদের মতো দ্বাররক্ষীদের চাকরির চুক্তিপত্রে গোপনীয়তা বজায় রাখার শর্তে স্বাক্ষর করতে হয় এবং তথ্য ফাঁস না করার বিষয়ে আইনগতভাবে তাঁরা বাধ্য। তুচ্ছ কারণে তাঁদের সহযোগিতা কামনা করবেন না এবং তাঁদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক গোপন রাখুন, যাতে তাঁদের পরিচয় প্রকাশের ঝুঁকি তৈরি না হয়।

যেকোনো অনুসন্ধানে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটা হলো, 'কার কাছে তথ্যটা আছে?' প্রায় ক্ষেত্রেই তথ্য সুরক্ষায় একাধিক দ্বাররক্ষী থাকেন। চিন্তা করুন: যদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আপনাকে নথি দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে অন্য কোনো সরকারি সংস্থা বা সংগঠনের কাছে একই নথি থাকতে পারে। যেমন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিংবা স্বাস্থ্যবিষয়ক অন্য কোনো এনজিও, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণারত কোনো বিশ্ববিদ্যালয়, অথবা সংসদের স্বাস্থ্যবিষয়ক উপকমিটির কোনো সদস্যের কাছে নথিটি থাকতে পারে, যিনি আপনার প্রতি সহানুভূতিশীল। আপনার সূত্রগুলোর মধ্যে যদি কোনো সার্ভেয়ার থাকেন, তিনি হয়তো কোনো স্পর্শকাতর তথ্য দিতে পারবেন না। তবে তিনি বলতে পারবেন, কে কী কাজ করেন, কার গুরুত্ব কত এবং কে সিদ্ধান্ত নেন।

তথ্যভান্ডারে প্রবেশাধিকার দিতে পারেন সেই ব্যক্তি, যিনি প্রভাবশালী। যদি তাঁরা আপনাকে পছন্দ করেন, বা আপনার কাজে তাঁদের বিশ্বাস থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট অন্যদের সঙ্গে তাঁরা আপনাকে কথা বলিয়ে দিতে পারবেন। দরজা খুলে দেওয়া ব্যক্তি অর্থাৎ, ডোর-ওপেনাররা হতে পারেন সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ অথবা যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ নন, তবে বিশ্বস্ত কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো সংগঠন বা সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আছেন। কখনো কখনো কোনো জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিষ্ঠিত নেতাও তাঁর সম্প্রদায়ের কারও সঙ্গে যোগাযোগে সহায়তা করতে পারেন। এসব ব্যক্তি যখন বলেন, অন্যরা তাঁদের কথা শোনেন: 'এই সাংবাদিক ভালো; আপনারা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।' এসব ব্যক্তিকে তাঁদের ইতিহাস ঘেঁটে চিহ্নিত করুন এবং যখনই সুযোগ হয়, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

সূত্র যখন মিথ্যা বলেন

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে "ভালো সোর্স" পাওয়া। একজন সোর্স যদি সৎ হন, তাহলে আপনার কাজের শুরুটা ভালো হবে। আপনি যদি সঠিকভাবে সঠিক তথ্য নিয়ে শুরু করতে পারেন, তাহলে পরের কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে এবং সময় কম লাগবে। কিন্তু সব সময় সোর্স আপনাকে সঠিক তথ্য দেবেন না,'—বলছিলেন দৈনিক প্রথম আলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদক রোজিনা ইসলাম। সরকারি দপ্তরে সোর্স তৈরি এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে।

দেশের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু বিশেষ মর্যাদা দেয়। তার একটি হলো সরকারি চাকরিতে অবসরের বাড়তি বয়সসীমা। ২০১৪ সালে রোজিনা ইসলাম একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করেন, যেখানে বেরিয়ে আসে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মুক্তিযোদ্ধার ভুয়া সনদ নেওয়ার বিষয়টি। এরপর ধারাবাহিকভাবে তিনি এই বিষয়ে আরও কয়েকটি প্রতিবেদন করেন এবং এর সূত্র ধরে আরও অনেক নাম বেরিয়ে আসে, সনদ বাতিল হয় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে।

আর এ সবকিছুরই শুরু একটি মিথ্যা তথ্য থেকে।

'ওই প্রতিবেদন করার আগে আমার সোর্স আমাকে একটি কাগজ দিয়ে বলল, এদের কারও মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেই। অথচ এক মাস পরে তাঁদের চাকরির মেয়াদ শেষ; আর তাঁরা এখন সনদ নিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেন, তাঁর দেওয়া তথ্যে ছিটেফোঁটা ভুল নেই,' জানান রোজিনা।

ওইখানে প্রায় ২৪ জনের নাম ও কিছু কাগজপত্র ছিল, যাকে বলা হয় 'পিডিএস'। তিনি খোঁজ নিয়ে দেখেন, সূত্রের দেওয়া পিডিএসের কাগজগুলো বানানো এবং তাঁদের বেশির ভাগই সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা। এই বিষয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে তাঁকে প্রায় তিন মাস সময় ব্যয় করতে হয়েছে। কারণ, প্রত্যেকেরই পিডিএস নিতে হয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে, যা অত্যন্ত গোপনীয়। 'তিন মাস কাজ করে যা পেলাম, তা দেখে মন খারাপ হলো। দেখলাম, এঁরা সবাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আগেই এঁদের সনদ নেওয়া। খুব মন খারাপ হলো,'—বলেন প্রথম আলোর এই জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক। তিনি পরে দেখতে পান, মিথ্যা তথ্য দেওয়ার পেছনে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে।

এই কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা হয় তাঁর। বের হয়, কারা আসলেই চাকরির শেষ সময়ে এসে সনদ নিয়েছেন। সর্বোপরি তাঁদের কাগজপত্র পর্যালোচনা ও খোঁজখবর নিতে গিয়ে জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের বয়স ছিল ৮-৯ বছর। তাঁরা নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা ঘোষণাও দেননি। তাঁরা অমুক্তিযোদ্ধা। রোজিনা জানান, তাঁর এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর এর সূত্র ধরে তদন্ত করে দুর্নীতি দমন কমিশন। তারা ঘটনার সত্যতাও পায়। কিন্তু প্রথমে সোর্স যে ২৪ জনের নাম বলেছিলেন, তাঁরা এঁদের মধ্যে ছিলেন না।

'আমার কাছে প্রায়ই কিছু মানুষ আসেন, যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করে জানান, এই প্রতিষ্ঠানের এত টাকা লুট হয়েছে, এই লোক এত বড় প্রতারণা করেছেন, এই চেয়ারম্যান প্রতিষ্ঠানের দশটি গাড়ি ব্যবহার করছেন; কিন্তু যখনই তাঁদের কাছে প্রকৃত কাগজপত্র চাই, তাঁরা জানাতেন, পরদিনই দিয়ে যাবেন। কিন্তু আর দিতে পারেন না,' বলছিলেন রোজিনা। তাঁর মতে, ব্যক্তিগত সমস্যা বা দ্বন্দ্বের কারণে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করে থাকেন। এই যে ভুল তথ্য বা মিথ্যা দিয়ে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে প্ররোচিত করার চেষ্টা করা হয়, এতে শুধু সময় অপচয় হয় না, সোর্সের প্রতি আস্থাও নষ্ট হয়। তিনি মনে করেন, এ কারণেই সোর্সের দেওয়া তথ্য যাচাই এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগেই নিশ্চিত হওয়া দরকার অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের।

মুখপাত্র বা স্পিন ডক্টরস

আমরা দাপ্তরিক মুখপাত্র ও তদবিরকারীদের মুখপাত্র বা 'স্পিন ডক্টরস' বলে থাকি: তাঁরা তাঁদের নিয়োগকর্তার স্বার্থ হাসিলের জন্যই বেতন পান এবং নানা ঘটনায় সবচেয়ে ইতিবাচক ব্যাখ্যা দেন। তবে এসব মুখপাত্রকে চিহ্নিত করা সব সময় সহজ নয়। মন্ত্রীর তথ্য কর্মকর্তা অবশ্যই এমন একজন। কিন্তু সেই সব সাংবাদিকের ব্যাপারে কী বলবেন, যাঁরা বিশেষ উদ্দেশ্যে বা দলের প্রচার-প্রসারের জন্য গোপনে অর্থ পেয়ে থাকেন? সরকারি বা বাণিজ্যিক সূত্র কিংবা কর্মকর্তাদের গোপন ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের বিষয়ে কী বলা যাবে? অথবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া 'বিশেষজ্ঞ' যাঁরা কোনো বিশেষ পণ্যের প্রসারে কাজ করেন? এবং বেনামে কোনো অপরিচিত ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন বা খবর? ছোট-বড় যেকোনো কারণে এসব মুখপাত্রকে ব্যবহারের হার দিন দিন বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, উপসাগরীয় যুদ্ধের বিষয়ে জনমত নিজের পক্ষে রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছিল এবং ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী গর্বের সঙ্গে নিজেকে 'তথ্যযোদ্ধা' হিসেবে পরিচয় দিতেন।

তবে ভুয়া খবর নিয়ে কাজ করার চেয়ে একজন স্বীকৃত মুখপাত্রের সঙ্গে কাজ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। আপনি জানেন যে মন্ত্রীর মুখপাত্র সমস্যার ওপর রং চড়িয়ে অর্জনের ওপর আলোকপাত করার জন্যই বেতন পান। কেবল সবচেয়ে অদক্ষরাই মিথ্যা বলেন। কারণ, সামান্য গবেষণা বা খোঁজখবরেই মিথ্যা ধরা পড়ে যায়। প্রাথমিক গবেষণায় গভীরতা এবং ভালো সাক্ষাৎকার কৌশলের মাধ্যমে ফাঁকি ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টাগুলো ধরে ফেলা যায়। মনে রাখতে হবে, মুখপাত্ররা কেবল তাঁদের কাজটাই করছেন, যেমনটা আপনি করছেন।

সরকারি মুখপাত্রদের পাশাপাশি সরকার এবং কিছু বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি গোয়েন্দা শাখাও থাকে, যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এবং কখনো কখনো নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে গোপনে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে সংবাদমাধ্যমে সাদ্দাম হোসেনের 'গণবিধ্বংসী অস্ত্র'-এর গল্প প্রকাশ করেছিল, পরে জানা যায়, যা তাঁর কাছে ছিল না।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোতে সংবাদমাধ্যমে প্রভাব বিস্তারের জন্য আলাদা একটা বিভাগ থাকে, যাদের নিয়মিত কাজের একটি অংশ হলো গণমাধ্যমে 'গল্প' গেলানো। তারা প্রায়শ সাংবাদিক কী জানেন, তা জানতে গোয়েন্দাগিরি করে, এমনকি তাঁদের নিয়োগ দেওয়ারও চেষ্টা করে। তবে কখনো কখনো তারা নিজেদের পছন্দের দিকগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য সাংবাদিকদের তথ্য দেয়, ফলে পাঠকদেরও তা-ই পড়তে হয়। কাজেই কেউ যখন গুরুত্বপূর্ণ অডিও রেকর্ড ও নথি দিয়ে 'সাহায্য' করতে আগ্রহী হন এবং তাঁদের আচরণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও খুবই সতর্ক হতে হবে।

১৯৮৮ সালে প্যারিসে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধি ডালসি সেপ্টেম্বরের খুনের ঘটনা অনুসন্ধান করেছেন ফোরাম ফর আফ্রিকান ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা ইভলিন গ্রোয়েনিঙ্ক। এ ঘটনায় ফরাসি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিজেদের ভূমিকা আড়াল করতে সংবাদপত্রে অনেক ভুয়া খবর ছাড়ে। তাতে দাবি করা হয়, বিদেশি ঘাতকেরা ডালসিকে হত্যা করেছে। গ্রোয়েনিঙ্ক আশ্বাস পেয়েছিলেন, তাঁকে 'এক ফরাসি অস্ত্র ব্যবসায়ীর কথাবার্তার ৩০০ ঘণ্টার টেপরেকর্ড' দেওয়া হবে। সেই অস্ত্র ব্যবসায়ীর কাছে প্রতারণার শিকার হওয়া এক ব্যক্তি

এই আশ্বাস দিয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সংবাদমাধ্যমের কাছে ওই সূত্রের মুখ খুলতে চাওয়ার যৌক্তিক কারণ ছিল: প্রতারিত হওয়ার পর প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু গ্রোয়েনিঙ্ক যখন 'কথিত প্রতারণার শিকার ব্যক্তির' বিপুল অর্থ, সময়, নজরদারি করার সুযোগ, উড়োজাহাজের টিকিট ও যোগাযোগের নেটওয়ার্ক নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে থাকলেন, তখনই তিনি লন্ডনে আত্মগোপনে চলে যান। তিনি লন্ডনেরই বাসিন্দা ছিলেন। গ্রোয়েনিঙ্কের সন্দেহ, সূত্রটি আসলে যুক্তরাজ্য সরকার বা দেশটির অস্ত্র নির্মাণশিল্পে কাজ করত।

মোটা দাগে নিয়ম হলো, সূত্র আপনাকে খুঁজে বের করার চেয়ে আপনি সূত্রকে খুঁজে বের করা ভালো। ধরা যাক, পরিচয় না জানিয়ে কেউ গোপনে দেখা করতে বলেছে আপনাকে। শর্ত দিয়েছে, তৃতীয় কাউকে সাক্ষাতের বিষয়ে কিছু বলা যাবে না। কারণ, 'শত্রুপক্ষ তাঁর পেছনে লেগে আছে'। এমন ক্ষেত্রে ওই সূত্র 'শত্রুপক্ষেরই' কেউ একজন হওয়ার আশঙ্কা বেশি! আপনি প্রায়ই এমন সব মানুষ পাবেন, যাঁরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে অনিচ্ছুক এবং শর্ত জুড়ে দেবেন যে তাঁরা যা-ই বলুন না কেন, তা অনানুষ্ঠানিক (অফ দ্য রেকর্ড) কিংবা তাঁদের নাম প্রকাশ করা চলবে না। এমন ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই যেকোনোভাবে ওই সূত্রের পরিচয় জানতে হবে। সূত্রের অতীত ইতিহাস যদি আপনার ভালো করে জানা না থাকে, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন না, তাঁরা কী ধরনের তথ্য দেওয়ার সামর্থ্য রাখেন।

সূত্রকে রক্ষার উপায় কী

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কখনো কখনো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে, বিশেষ করে যেসব দেশে স্বৈরশাসন চলছে, আইনের শাসন দুর্বল এবং সাংবাদিকেরা গ্রেপ্তার বা হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে পারেন। কাজেই কখনো কখনো গোপনে কাজ করাটা জরুরি। প্রকাশিতব্য প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সূত্রকে সতর্ক করা আপনার দায়িত্ব। সেই সঙ্গে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলে সমাজের লাভ ও জনস্বার্থ সম্পর্কেও তাঁকে জানাতে হবে। এসব বিষয়ে আলোচনার পরই কেবল আপনি বলতে পারেন যে সূত্র 'সজ্ঞানে' নাম প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। ই-মেইলে বা ফোনে যোগাযোগের ঝুঁকি সম্পর্কে সূত্র ঠিকঠাক বুঝেছেন কি না, তা-ও নিশ্চিত হতে হবে।

যেখানে আড়ি পাতা, ফোনকল রেকর্ড করা বা ই-মেইল হ্যাক হওয়ার ঝুঁকি থাকে, সেখানে সূত্র সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু আলোচনা করবেন না। মনে রাখতে হবে, মুঠোফোনের কলসহ ফোন রেকর্ড পাওয়া এবং আপনার অবস্থান শনাক্ত করা খুব সহজ। গোপন কোনো সাক্ষাতে যাওয়ার আগে আপনার মুঠোফোন বন্ধ করে এর ব্যাটারি বের করে ফেলুন। সূত্র সম্পর্কে তথ্য রয়েছে এমন কোনো নোট নিরাপদ জায়গায় রয়েছে, তা নিশ্চিত করুন; অথবা তৃতীয় কারও কাছে রাখতে পারেন, যিনি আপনার অনুসন্ধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন।

প্রভাবশালীদের অপরাধ, কথার ঘোরপ্যাঁচ, মিথ্যা ও ভুল তথ্য মোকাবিলার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো এমন সূত্র খুঁজে বের করা, যিনি রাখঢাক না করে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। তেমন সূত্র খুঁজে পেতে আপনার সময় লাগবে। যদিও আপনি কথা বলতে বা আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য জানাতে কাউকে জোর করতে পারেন না। তাঁদের সংশয়ের কারণ আপনাকে বুঝতে হবে; বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাবেন না। একটি ভালো প্রশ্ন হতে পারে: 'আপনার নাম যদি প্রকাশ পায়,

তাহলে কী হতে পারে?' কখনো কখনো ভয়টা ব্যক্তিগত; সূত্র যদি অনিবন্ধিত অভিবাসী হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পরিচয় প্রকাশের পরপরই তাঁকে বিতাড়ন করা হবে; একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হয়তো বরখাস্ত, এমনকি গ্রেপ্তারও হতে পারেন; এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তি হয়তো সমাজের অন্যদের আক্রমণের শিকার হবেন। তথ্য আদান-প্রদানের আগে সূত্রের কাছে ব্যাখ্যা করুন যে অন্য কারও কাছে হয়তো তাঁদের পরিচয় আপনাকে জানাতে হবে। ব্যাখ্যা করুন, কীভাবে আপনি তাঁদের অবস্থান, অতীত ইতিহাস, সামাজিক অবস্থান, এমনকি লিঙ্গসহ যাবতীয় পরিচয়ের কথা গোপন রাখবেন। সূত্র কোনো তথ্য বা পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ করলে কিংবা কোনো অংশ অনানুষ্ঠানিক অথবা অফ দ্য রেকর্ড দাবি করলে তাঁর সেই অনুরোধ মেনে নিন; অনানুষ্ঠানিকভাবে দেওয়া তথ্য যে শুধু পটভূমি ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হবে, সে বিষয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করুন। তাঁকে বোঝাতে হবে যে আপনার সম্পাদক এবং অন্য যে সহকর্মীরা প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট হবেন, তাঁরাও বিষয়টি বুঝবেন। আপনার সম্পাদক হয়তো সূত্রের নাম প্রকাশ করতে বলবেন। আপনি যখন এটি করবেন, পুরোপুরি পরিষ্কার করুন যে এই তথ্য সম্পাদকের কার্যালয়ের বাইরে যাবে না। প্রতিবেদক ও সূত্রের মধ্যে এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি। পরিচয় গোপন রাখার প্রতিশ্রুতি কাউকে দিয়ে থাকলে আপনাকে অবশ্যই সেই প্রতিশ্রুতি রাখতে হবে; এমনকি যদি তাঁর পরিণতিতে কারাবরণ করতে হয়। তবে আগেভাগেই সূত্রকে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যা আপনি রাখতে পারবেন না; প্রতিশ্রুতি রাখতে না পারার কারণে কোনো সূত্রের নির্যাতন বা মৃত্যুর নৈতিক দায়বদ্ধতা বহনের চেয়ে অজ্ঞাত বা গোপন সূত্রের তথ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরি অপেক্ষাকৃত ভালো।

মনে রাখতে হবে, অনেক দেশে সূত্রের নাম-পরিচয় জানতে প্রতিবেদক ও সম্পাদকদেরও নির্যাতন করা হয়। যেহেতু এসব দেশে সংবাদমাধ্যমের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ফৌজদারি আইনে বিচার হয়, কাজেই বিচারে সূত্রের নাম প্রকাশের নির্দেশ আসতে পারে, এবং এই নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানানোর অর্থ আদালতের কাজে বাধা বা আদালত অবমাননার মতো অপরাধ বলে গণ্য হতে পারে, আর তা হলে কারাদণ্ড হতে পারে। কাজেই সূত্রকে রক্ষায় আপনি কত দূর পর্যন্ত যেতে পারবেন, তা অনুসন্ধান শুরুর আগে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

স্যাম সোল, মেইল অ্যান্ড গার্ডিয়ান, জোহানেসবার্গ

'নিজের একটি সূত্র খুন হওয়ার ঘটনা সাংবাদিক হিসেবে আমার জন্য সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা। কারণ, ওই সূত্র আমাকে যত তথ্য দিয়েছিলেন, এর চেয়ে অনেক বেশি তথ্য তাঁর নিজের কাছে ছিল। কিন্তু তিনি একটু প্রতিক্রিয়া দেখতে চেয়েছিলেন। নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে তিনি কাজ করতেন, তাঁদের বুঝে উঠতে সমস্যা হয়নি এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। কাজেই সূত্র হিসেবে আপনার এলোমেলোভাবে বা টুকরো টুকরোভাবে তথ্য দেওয়া উচিত নয়, যাতে আপনাকে মৃত্যুর ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়। তার চেয়ে বরং নিজের নাম ব্যবহার করে ঝুঁকি নেওয়া ভালো, যাতে আপনার কিছু হলে বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায় আপনার তথ্য ফাঁসের কারণে (হুইসেলব্লোয়িং) তা ঘটেছে। সূত্রকে সুরক্ষা দেওয়ার এটি আরেকটি পদ্ধতি।'

সূত্রের পরিচয় গোপন রেখে প্রতিবেদন তৈরির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সূত্রকে রক্ষা করা। অজ্ঞাত সূত্রকে পর্যবেক্ষণে রাখা কঠিন, এর মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন উৎসাহিত হয় এবং নিশ্চিতভাবেই প্রতিবেদনে পাঠকের বিশ্বাসযোগ্যতা কমে। তবে অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণকে এ ধরনের সূত্রের প্রত্যক্ষ বিবরণ, ভেতরের খবর, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে নিশ্চিত করতে পারে, কিংবা সেদিকে পথ দেখাতে পারে। কাজেই পরিস্থিতির নিরিখে সূত্র ও প্রতিবেদন প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করুন। প্রতিবেদনে আপনি সূত্রকে কীভাবে উপস্থাপন করবেন, সে ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে সমঝোতায় আসুন এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বর্ণনা যতটা সম্ভব স্পষ্ট করুন। প্রতিবেদনে 'একজন বিজ্ঞানী' লেখার চেয়ে 'বন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করা একজন পরিবেশবিজ্ঞানী' বিবরণটি অপেক্ষাকৃত ভালো; যদি না ওই মন্ত্রণালয়ে তিনিই একমাত্র পরিবেশবিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করে থাকেন।

নিজের সুরক্ষা

দেশভেদে সাংবাদিকের সুরক্ষা আইনের ভিন্নতা আছে। ঠিক যেমন ভিন্নতা আছে আদালতে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি নয়, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে। কাজেই এই আইনগুলো সম্পর্কে জানা আপনার দায়িত্ব। আপনি কী ধরনের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছেন এবং তার সম্ভাব্য পরিণতি কী হবে, তা-ও আপনাকে বুঝতে হবে।

সূত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন জায়গাটা ভালো হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনসমক্ষে দেখা করা ভালো, নাকি একান্তে। সাক্ষাতের সময় আশপাশে মানুষ ও কোলাহল থাকা ভালো, নাকি তা হওয়া উচিত গোপন পরিত্যক্ত কোনো জায়গায়। সাক্ষাতের এলাকা ক্যামেরা নজরদারির আওতায় আছে কি না, তা-ও বিবেচনায় রাখুন। যদি আশঙ্কা থাকে, কেউ স্পর্শকাতর আলোচনা শুনে ফেলতে পারে, তাহলে কোলাহলপূর্ণ এলাকায় সাক্ষাৎ করুন। কোলাহলের কারণে আপনাদের কথাবার্তা অন্যের (এবং আড়ি পাতা যন্ত্র) জন্য শোনা কঠিন হয়ে পড়বে।

তবে রেকর্ড রাখুন– লিখিত, কম্পিউটারে কিংবা অডিও বা ভিডিও রেকর্ডে। রেকর্ড যথাসম্ভব সঠিক হতে হবে, তারিখ থাকতে হবে এবং তা এমনভাবে রাখতে হবে যেন প্রয়োজন হলেই তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। সূত্রের কাছে যে তথ্য আছে বলে তিনি দাবি করছেন, তা তাঁর কাছে থাকা সম্ভব কি না, সে ব্যাপারে একদম পরিষ্কার হয়ে নিন। সূত্র আসলেই কী দেখেছেন বা জেনেছেন কিংবা বলার জন্য প্রস্তুত আছেন, তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোঁজখবর করুন এবং সূত্রের পুরো বক্তব্যেরই বিস্তারিত হুবহু লিখুন বা রেকর্ড রাখুন। নিজের ভাষায় লিখতে যাবেন না। সূত্রের সঙ্গে আপনার হওয়া সব ধরনের যোগাযোগের পূর্ণ রেকর্ড রাখুন। তাঁর দাবি করা অর্থ নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে বা তাঁকে অর্থ দেওয়ার সময় যে কথা হয়েছে, তার রেকর্ডও রাখুন। প্রতিবেদন তৈরির ব্যয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রসিদগুলোও সংরক্ষণ করুন।

সূত্রের সঙ্গে স্বচ্ছ ও সৎ সম্পর্ক বজায় রাখুন। কোনো কারণেই তাঁদের সঙ্গে মিথ্যা বলবেন না বা বিভ্রান্ত করবেন না। যে প্রতিশ্রুতি রাখতে পারবেন না, তা সূত্রের সঙ্গে করবেন না, কিংবা এমন কোনো পরিণতির ভবিষ্যদ্বাণী করবেন না, যা হয়তো ঘটবেই না। সূত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতায় জড়িয়ে পড়বেন না বা তাঁদের এমন কোনো সমস্যা সমাধান করতে যাবেন না, যার কারণে তাঁদের সঙ্গে পেশাদারি দূরত্ব রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

আপনাকে যে সত্য বলা হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে আপনার সব ধরনের চেষ্টাই চালাতে হবে। কাজেই সূত্রের দেওয়া তথ্য আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা পেশাদারির সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় ও সংশয়ের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। তাঁদের ব্যক্তিগত বিস্তারিত তথ্য যাচাই করে নিন এবং যে তথ্য তাঁরা লুকানোর চেষ্টা করেন, সে ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ হোন। কঠিন কঠিন প্রশ্ন করুন। তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদ ও সমস্যার ব্যাপারে প্রস্তুত হোন এবং ভুল কিছু ঘটছে কি না, সে ব্যাপারে সব সময়ই জিজ্ঞাসাবাদ করুন। নির্ভুল প্রত্যক্ষদর্শী বলে কিছু নেই এবং কোনো সূত্রের সম্পর্কে আপনি আগে জানতেন না এমন কোনো তথ্য পরবর্তী সময়ে কেউ দিলে আপনি অবাক হবেন না। সূত্রকে সুরক্ষা দেওয়ার বিষয়ে আপনার দেওয়া প্রতিশ্রুতির বাইরে তিনি যদি আপনার প্রতিবেদন তৈরি বা তার উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে চান, তবে তা প্রতিহত করুন।

হলফনামা

আপনার ও আপনার প্রত্যক্ষদর্শীর সুরক্ষার জন্য একটি উপায় হতে পারে আইনিভাবে স্বীকৃত, স্বাক্ষরিত, সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রচিত হলফনামা। এ ধরনের আইনি বিবৃতি, যার প্রতিটি পৃষ্ঠায় আইনজীবীর উপস্থিতিতে স্বাক্ষর করা হয়, বেশির ভাগ দেশের আদালতে গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ। এতে ইঙ্গিত বহন করে যে প্রয়োজন পড়লে আপনার সূত্র স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হয়ে প্রমাণ দেবেন। বিশ্বাসযোগ্য কোনো আইনজীবীর কাছেই হলফনামা সংরক্ষণ করতে দিতে হয়। আপনার প্রতিবেদনের কারণে কোনো আইনি চ্যালেঞ্জ বা পদক্ষেপ এলে এই হলফনামাই পরিষ্কার করে দেবে যে আদালত সুরক্ষার ব্যবস্থা করলে আপনার সূত্র নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে প্রস্তুত আছেন। প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য যদি আপনার সূত্র পরে অস্বীকার করেন, তাহলে এই হলফনামা আপনাকে সুরক্ষা দেবে।

হলফনামাটি আপনার প্রতিবেদনে সাহায্য করবে কি না, তা চিন্তা করুন। আপনার সোর্স হয়তো আইনি কাগজপত্রের আনুষ্ঠানিকতা দেখে ভয় পেয়ে যেতে পারে। ফলে আগে আপনাকে তাঁর আস্থা অর্জন করতে হবে; কিংবা দলিলপত্র, রেকর্ডিংয়ের মতো তথ্যপ্রমাণের সুরক্ষার জন্য অন্য কোনো পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে হবে।

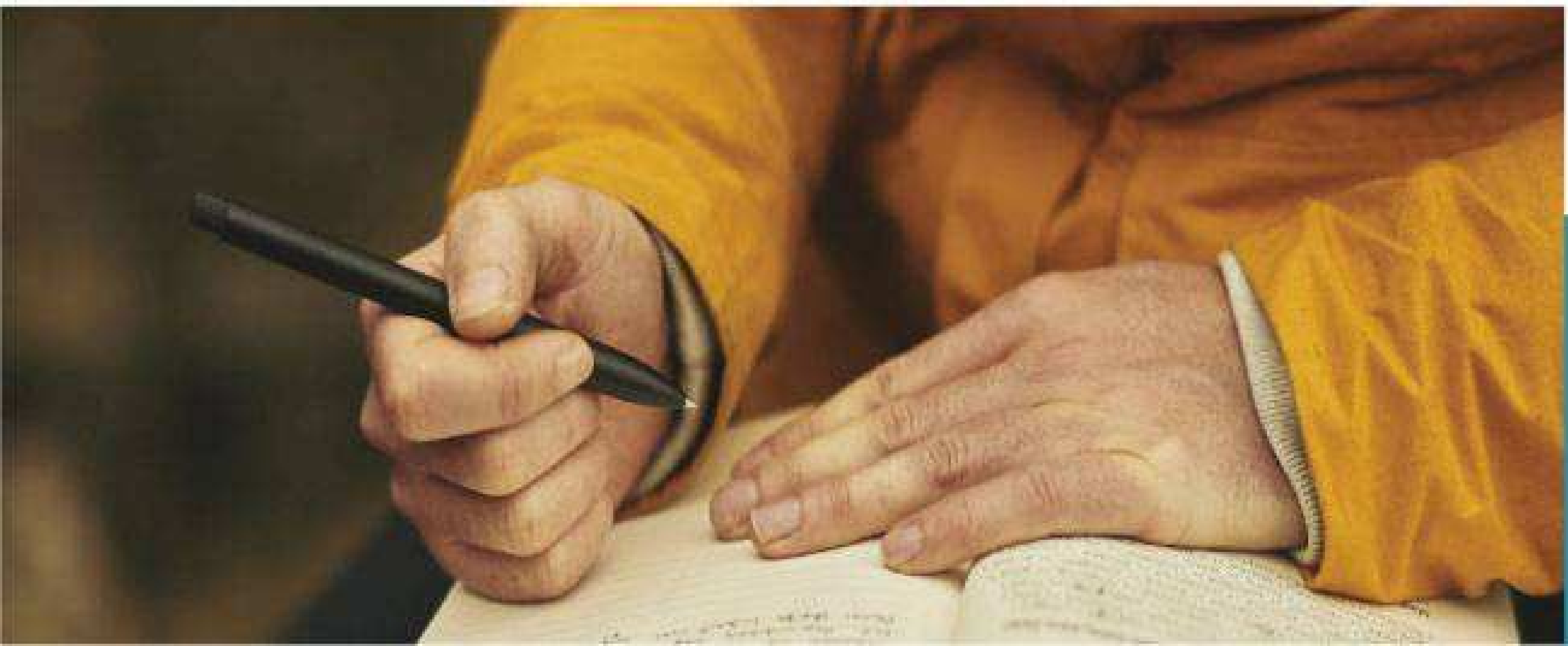

হুমকি ও হয়রানি মোকাবিলা

আপনি যাঁর ব্যাপারে প্রতিবেদন করছেন, তিনি যদি ক্ষমতাধর ও বিপজ্জনক হয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো ব্যক্তিগত সংঘাত এড়াতে আপনি সরাসরি সাক্ষাতের বদলে তাঁর কার্যালয়ে প্রশ্ন পাঠিয়ে জবাব চাইতে পারেন। তাঁদের এলাকায় না ঢোকা এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে নিজের চেহারা না চেনানোই এ ক্ষেত্রে উত্তম। লিখিত প্রশ্নের উত্তর (সাক্ষাৎকার) হয়তো ততটা ভালো হবে না, কিন্তু প্রতিবেদনটি রচনার জন্য অন্তত আপনি জীবিত থাকবেন।

এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির কাজ শুরু করার আগে জেনে নিন, আপনার প্রতিষ্ঠান আপনাকে কতটা সুরক্ষা দিতে পারবে। আপনি যদি ফ্রিল্যান্সার হয়ে থাকেন, তাহলে নিজের সুরক্ষার কিছু ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

ক্ষমতাধর কোনো ব্যক্তি বা সত্তাকে গুরুতর কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা আইনি ঝামেলাসহ শারীরিক হামলা ও হুমকির ঝুঁকি তৈরি করে। আইনি হুমকি হয়তো আপনার সম্পাদক যেন প্রতিবেদনটি প্রকাশ না করেন, সে জন্য দেওয়া হয়। এবং তিনি হয়তো সেটাই করবেন। কিন্তু আপনার তথ্য যদি সঠিক হয়, তাহলে সম্পাদককে বোঝানোর চেষ্টা করুন যে এ ধরনের মানুষেরা হুমকি দিলেও মানহানির মামলা খুব একটা করেন না। প্রথমত, তাঁদের এমনিতেই দুর্নাম আছে, যা আদালতে তাঁদের অবস্থান দুর্বল করে দেবে (এই যুক্তি উদাহরণস্বরূপ অস্ত্র বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে খাটে); এবং দ্বিতীয়ত, আদালতে একটি মামলার কারণে যে তথ্য তাঁরা গোপন করার চেষ্টা করছেন, তার সব সাক্ষ্যপ্রমাণ বেরিয়ে আসতে পারে। আপনি যদি এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে কাজ করেন, যিনি ভয়ভীতি দেখান, বিচারে প্রভাব বিস্তার করেন অথবা অন্য যেকোনো প্রকার হুমকি দেন, তাহলে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস অথবা রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স-এর মতো প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য কামনা করুন।

আরও তথ্য দেখতে পারেন এখানে:
https://www.cpj.org/about/ অথবা https://rsf.org/en

ঝুঁকির মুখে থাকা সাংবাদিকদের সহায়তা করছে এমন সংগঠনগুলোর খোঁজ পাবেন এখানে:
http://gijn.org/2014/07/14/new-resource-guide-emergency-assistance/

সূত্র বাছাই এবং তাঁদের সঙ্গে দেখা করার ঝুঁকি যাচাইয়ের পর সময় হচ্ছে আসল সাক্ষাৎকারের। পরবর্তী অধ্যায়ে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলোর পরিকল্পনা, সাক্ষাৎকারের সময় কেমন আচরণ করা উচিত এবং সফল হওয়ার জন্য যেসব নীতি অনুসরণ করা উচিত, তা আলোচনা করা হবে।

৭

অধ্যায় ৭

যথাযথ প্রশ্ন করুন

সাংবাদিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে সাক্ষাৎকার। কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য একটু বেশি প্রস্তুতি নিতে হয়; খবরের বিষয় ও সূত্রগুলো সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সবকিছু জানতে আগেই খোঁজখবর করে নিতে হয়। তাহলেই কেবল আপনি জুতসই প্রশ্নগুলো করতে পারবেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হতে পারে স্পর্শকাতর, তা বিতর্কের জন্ম দিতে পারে কিংবা তাতে কারও সুনামও নষ্ট হতে পারে। আবার এর সবই একযোগে হতে পারে। এ কারণেই সাক্ষাৎকারের দক্ষতা শাণিয়ে নেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আপনি ছক করে নিতে পারেন কী ধরনের প্রশ্ন করবেন কিংবা কোন প্রশ্ন আগে এবং কোন প্রশ্ন পরে করবেন। তা ছাড়া সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় কিছু নৈতিক বিষয়ও বিবেচনায় রাখতে হবে।

যোগাযোগ স্থাপনের অন্য সব কাজের মতো সাক্ষাৎকারও একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। সাক্ষাৎকারের ফলাফল কেমন হবে, তা সাক্ষাৎকারদাতার ওপর যতটা নির্ভর করে, ঠিক ততটাই নির্ভর করে আপনার ওপর। ভালো সাক্ষাৎকারে একটি আলাপচারিতার আবেশ থাকে। একই সঙ্গে এটি আপনার কাঙ্ক্ষিত উত্তরগুলো বের করে আনার একটি পরিকল্পিত কৌশলেরও অংশ।

সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে আপনাকে খবরের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জানতে হবে এবং তার সঙ্গে সূত্রের যোগসূত্র বুঝে নিতে হবে। এটি করার জন্য আপনাকে সেসব লেখা ও নথিপত্র ঘেঁটে দেখতে হবে, যেখানে আপনার অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপট ও পূর্ব-পরম্পরা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। বিপরীতে, এটি আপনাকে উপযুক্ত প্রশ্নমালা তৈরি এবং সেগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা পেতে আপনাকে সাহায্য করবে। বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পরিকল্পনা করুন। তা না হলে আপনি গুটিকয়েক মানুষ বা সূত্রের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার ঝুঁকিতে পড়বেন, যাঁরা হয়তো ঘটনা বা ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরের চরিত্র। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আপনি এমন কোনো স্থানে গেলেন, যেখানে খামারকর্মী, শিল্পশ্রমিক বা এ-জাতীয় পেশার লোকজন কাজ করেন। সেখানে সহজেই দেখতে পাবেন, কর্মীরা নিয়োগদাতার হাতে কতটা ভুক্তভোগী। কিন্তু আপনি যখন কোনো বড় শহরের কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) কার্যালয়ে যাবেন, তখন এটা সাধারণ চোখে ধরা পড়বে না। তাই আপনি সরেজমিনে যা দেখছেন, আর কাগজে-কলমে লেখা নীতিমালা বা বাজেটে ওই বিষয়ে যা পাচ্ছেন, তার মধ্যে তুলনা করুন এবং মিল-অমিল যাচাই করুন। অন্যান্য জায়গা বা বিভিন্ন সময়ে একই ধরনের ঘটনায় যা যা ঘটেছে, সেগুলোর সঙ্গে আপনার অনুসন্ধানের তুলনা করে নিন। অগ্রিম এই প্রস্তুতি নিয়ে রাখলে আপনি প্রাসঙ্গিক সব প্রশ্ন করতে সক্ষম হবেন এবং আপনার প্রতিবেদনের জন্য দরকারি তথ্যগুলো বের করে আনতে পারবেন।

১.১ মানুষকে দিয়ে কথা বলিয়ে নেওয়া

আপনার প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে, যাঁর বলার মতো কাহিনি আছে, এ রকম ব্যক্তির অফিসে আপনি হঠাৎ করে ঢুকে গিয়ে (যদিও মানুষ অনেক সময় এটাকে ভালোভাবে নেয় না) অথবা ফোন করে সাক্ষাৎকার নিতে পারেন। আপনি হয়তো এমন একটি সূত্রের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন, যাঁর সঙ্গে দেখা করার পথে বারবার বাধা আসছে। এমন হলে আপনি সেই ব্যক্তির গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারেন। তাঁর অফিসের বিশ্রাম কক্ষ বা লবি, অথবা উন্মুক্ত কোনো অনুষ্ঠান যেখানে সেই ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার কথা আছে, সেসব জায়গায় গিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে পারেন। অবশ্য এই কৌশলে হিতে বিপরীতও হতে পারে। একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ: এমন কোনো আচরণ করবেন না, যাতে মনে হয় আপনি তাঁদের জন্য ওত পেতে আছেন। আপনাকে অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে নিজের পরিচয় দিতে হবে। জানাতে হবে যে তাঁদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলে আপনি খুশি হবেন। সন্দেহ তৈরির আশঙ্কা থাকলে আপনি একজন মধ্যস্থতাকারীর কথা ভাবতে পারেন। ওই ব্যক্তির চেনা-জানা গণ্ডির মধ্যে সেই মধ্যস্থতাকারী হবেন একজন 'দ্বার-উন্মোচক'। কোনো কোম্পানি, সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সহযোগী কোনো প্রতিষ্ঠানের কারও সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠানটির প্রেস অফিসের মাধ্যমে অনুরোধ করতে হবে। সব ক্ষেত্রেই আপনাকে নম্র আচরণ করতে হবে।

একটা কৌশল কাজে দিতে পারে। কাউকে ফোন করা বা সরাসরি সাক্ষাৎ করার আগে খুবই সংক্ষিপ্ত একটা মহড়া করে নিন। তাতে থাকবে আপনার সাক্ষাৎকারের প্রধান প্রধান পয়েন্ট সংবলিত একটা সূচনা বক্তব্য। এই পর্যায়ে আপনাকে একটা বিষয় ভাবতে হবে। সেটা হচ্ছে, সাক্ষাৎকারদাতার কাছে আপনি কখন প্রকাশ করবেন যে আপনি একজন সাংবাদিক। কোন পরিস্থিতিতে আপনি নিজের পেশাগত পরিচয় গোপন করে অন্য কোনো পরিচয় দেবেন (যেমন, বিক্রয় প্রতিনিধি)। কীভাবে আপনি সেই 'ভূমিকা'কে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবেন।

আপনি হয়তো কারও সঙ্গে প্রথমবার অনানুষ্ঠানিকভাবে দেখা করলেন, যাঁর সঙ্গে ভবিষ্যতেও কথা বলতে হতে পারে। তাই তাঁকে কীভাবে একটা সূত্রে পরিণত করা যাবে, সেই চিন্তা নিয়ে কাজ করুন। পরিকল্পনার ছক এঁকে নিন। আলাপে যেসব ইস্যু আসতে পারে, তা ঠিক করে নিন। সেই ব্যক্তির আগ্রহের বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন। তাঁর কর্মস্থলে যেসব ইস্যু আছে, সেগুলো সম্পর্কে তাঁকে আলোচনা করতে কীভাবে উৎসাহিত করা যাবে। একজন পদস্থ সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে আপনার নিজেকে উপস্থাপনা যেমন হবে, তার চেয়ে পানশালার একজন কর্মীর সঙ্গে আচরণ কী আলাদা হবে। হলে সেটা কীভাবে। যেসব ব্যক্তি দৃশ্যত রুটিন কাজ করেন, কখনোই তাঁদের বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করে দেখবেন না! এর জন্য কতটা সময় লাগতে পারে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ও বাস্তববাদী হোন। সরকারের একজন মন্ত্রীর ক্ষেত্রে ১৫ মিনিট হবে খুবই লম্বা সময়। কিন্তু মানসিক আঘাত পেয়েছেন, এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে খোলামেলা উত্তর পেতে হয়তো পুরো একটা দিনই লেগে যেতে পারে।

কোনো সূত্র আপনাকে আগেভাগেই প্রশ্নমালা পাঠাতে বললে, আপনাকে হয়তো তাই করতে হবে। কিন্তু একে সাধারণত ভালো চর্চা বলে মনে করা হয় না। সাক্ষাৎকারের বিষয়বস্তুর ওপর একটা মোটামুটি রূপরেখা পাঠালে হয় কি না, সেই চেষ্টাও করে দেখতে পারেন। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের কাছে আগেভাগে প্রশ্নমালা পাঠালে তা একটা বাগাড়ম্বরপূর্ণ, কৃত্রিম সাক্ষাৎকারে পরিণত হতে পারে। কখনো কখনো তথ্য জোগাড় করার জন্য বিশেষজ্ঞদের সময় দরকার হয়। তাই জানিয়ে রাখুন, ফলোআপের জন্য তাঁর কাছে আবারও আসতে হতে পারে।

আবার এমনও হতে পারে, কোনো সূত্র আপনার সঙ্গে দেখাই করতে চায় না, শুধু একটা লিখিত বিবৃতি দিতে চায়। এ ক্ষেত্রে আপনাকে সম্পাদকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং প্রতিবেদনে তা ব্যবহারের উপযুক্ত উপায় কী হবে, তা ঠিক করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যাখ্যাটি হবে এ রকম: 'আমরা সাক্ষাৎকারের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলাম, কিন্তু কাউকেই পাওয়া যায়নি। অবশ্য আমাদের কাছে ফ্যাক্সের মাধ্যমে একটা বিবৃতি পাঠানো হয়েছে।' এরপর বিবৃতিটি পূর্ণাঙ্গভাবে তুলে ধরতে হবে।

আগেই ঠিক করুন কোন কোন প্রশ্ন করবেন

আপনার সাক্ষাৎকারের কাঠামো এমনভাবে সাজিয়ে নিন, যাতে সেটা যদি সফল না-ও হয়, তবু আপনি যেন এমন কিছু তথ্য উদ্ধার করতে পারবেন, যা আপনার কাজে লাগবে।

১. ওয়ার্ম আপ (পরস্পরের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি করা)
২. মৌলিক তথ্য, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে জানা বিষয়গুলো নিশ্চিত করা
৩. 'নমনীয়' প্রশ্নমালা
৪. 'শক্ত' প্রশ্নমালা

খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে সোর্সকে কথা বলায় স্বাচ্ছন্দ্য করতে কতটা সময় লাগবে, সে বিষয়ে একটা আন্দাজ করে নিন। তবে সাক্ষাৎকারের প্রাথমিক ধাপগুলো, সাংস্কৃতিক রীতিনীতি মেনে সৌজন্য প্রদর্শন সাপেক্ষে, সংক্ষিপ্ত ও হালকা রাখার চেষ্টা করুন। এরপর যত দ্রুত সম্ভব মূল বিষয়ে প্রবেশের চেষ্টা করুন। আপনার সাক্ষাৎকারে একটা যৌক্তিক কাঠামো নিশ্চিত করুন। প্রথমে সেসব প্রশ্ন করুন, যাতে আপনার দরকারি তথ্যগুলো বেরিয়ে আসে। তুলনামূলক চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নগুলো পরে করুন। আপনার প্রশ্নগুলো অবশ্যই সহজে বোধগম্য, পরিষ্কার ও যথাযথ হতে হবে। একটা দীর্ঘ ও জটিল এলোমেলো প্রশ্নের চেয়ে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ছোট ছোট কয়েকটি প্রশ্ন অনেক ভালো। কারণ, দীর্ঘ প্রশ্নে আপনার সূত্রটি খেই হারিয়ে ফেলতে পারেন। এসব প্রশ্ন আগেভাগেই আপনার মাথায় সাজিয়ে নিন।

কিছু পরামর্শ

- একই প্রশ্নে অনেক উত্তর চাওয়ার প্রবণতা এড়িয়ে চলুন: 'মাননীয় মন্ত্রী, আপনি কি টেন্ডারে অনিয়মের বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন। আপনি কি এই প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। কেন তেমনটি করলেন এবং চুক্তিটি কেন হলো।' এমন প্রশ্ন করলে আপনার সূত্রটি শুধু প্রশ্নের সেই অংশটিরই উত্তর দেবেন, যেটি তিনি আলোচনা করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন।
- দ্বৈত নেতিবাচক প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন। কারণ, এমন বিষয় অযাচিত সংশয় সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ: 'এটা কি সত্য নয় যে আপনি ওই অর্থ ফেরত দেননি।' এমন প্রশ্নে সেই অর্থ সম্পর্কে দুটি উত্তরের একটা আসতে পারে। অথবা সেই বিবৃতির কেবলই সত্যতা সম্পর্কে উত্তর আসতে পারে। 'এটা কি সত্য যে আপনি ওই অর্থ ফেরত দেননি।' এটা হবে অধিকতর সহজ ও স্পষ্ট; 'আপনি কি ওই অর্থ ফেরত দিয়েছেন।' এটা হবে আরও ভালো প্রশ্ন।
- যেগুলো শুধু নিশ্চিত করা প্রয়োজন তেমন প্রশ্নগুলো যুক্ত করুন। এগুলো এমন প্রশ্ন, যার উত্তর আপনি জানেন। এটা মৌলিক বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। আর এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার সূত্র সঠিক তথ্য দিচ্ছে কি না। সাক্ষাৎকারদাতা যদি প্রশ্নের সাদামাটা ভাব দেখে বিভ্রান্ত হন, তবু আপনি কিছু মনে করবেন না। যদিও দরকার হয় না, তবু আপনি বিষয়টির ব্যাখ্যায় বলতে পারেন: 'পাঠক এই উত্তরটি আপনার মুখ থেকে শুনতে চান, আমার মুখ থেকে নয়।' বদ্ধ প্রশ্ন (অন্য ভাষায়, যার উত্তর আসে হ্যাঁ, না বা এমন এক শব্দে)-এর সঙ্গে ফারাকের বিষয়টি মাথায় রাখুন।
- উন্মুক্ত প্রশ্ন করুন। এই প্রশ্নগুলোতে আপনার সোর্স তাঁদের ধারণা সম্পর্কে আরও খোলামেলা কথা বলতে আগ্রহী হবেন। উন্মুক্ত প্রশ্নগুলো আপনার সামনে একটি ভাষ্য হাজির করে। অন্যদিকে বদ্ধ প্রশ্ন আপনার প্রতিবেদনের নির্ভুল তথ্য হাজির করে। এই দুইয়ের মিশেল ব্যবহার করুন।

সরঞ্জাম দেখে নিন

সাক্ষাৎকারের আগেই কোন ধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করবেন, ঠিক করে নিন। নিশ্চিত হোন, আপনার রেকর্ডিং ও লেখার সরঞ্জাম ঠিকঠাক কাজ করছে কি না। সব সময় কিছু বাড়তি সরঞ্জাম (কলম, রেকর্ডার, ব্যাটারি, এসডি কার্ড ইত্যাদি) সঙ্গে রাখুন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় যদি সাক্ষাৎকারদাতার কোনো রিলিজ ফরমে সই করানোর দরকার থাকে, তাহলে আপনি তা সঙ্গে নিয়েছেন কি না নিশ্চিত হয়ে নিন। বিশেষত দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ পরে একটা সম্প্রচারের মধ্যে জুড়ে দিতে হতে পারে। এটা করপোরেট বা রাজনৈতিক মুখপাত্রদের জন্য দরকার পড়ে না। তাঁদের চাকরির ধরনের কারণে তাঁরা সাক্ষাৎকার দিতে এবং তা আপনার ব্যবহারের বিষয়ে সম্মত হয়েছেন, তা সে আপনি যেভাবেই ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিন না কেন। অবশ্য, আপনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, সেটা তাঁদের পছন্দ না হলে তাঁদের অভিযোগ করারও অধিকার রয়েছে।

সাক্ষাৎকারের সময় আচরণ

সাংবাদিকেরা প্রায়ই মন্দ আচরণের জন্য সমালোচিত হন। বলা হয়ে থাকে, তাঁরা অতি উৎসাহী; অনেক সময় ঘটনার উত্তেজনায় ঘি ঢালেন, মানুষের সুনাম নষ্ট করেন; বিরোধীদের পক্ষে কাজ করেন; উদ্যমী লোকজনের কাজে ব্যাঘাত ঘটান; অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতায় ঘাটতি থাকে; এ ধরনের অনেক অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে। মাঝেমধ্যে অভিযোগের সত্যতাও থাকে। এ ধরনের নেতিবাচক ধারণা কাটাতে শালীন ও নৈতিক আচরণ করতে হবে। আপনার কখনোই রূঢ় হওয়া চলবে না; এমন কিছু দাবি করবেন না, যা অযৌক্তিক। আপনি যদি এমন ভাব দেখাতে থাকেন, যাতে মনে হয় সব তথ্যের ওপর শুধু আপনারই অধিকার; তাহলে সোর্স ও সমাজের অন্যান্য জায়গা থেকে আপনার প্রতি বৈরিতা বাড়বে।

বেশির ভাগ মানুষই বিশ্বাস করেন যে তাঁরা ভালো ও সৎ। সুতরাং, সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে আপনি তাকেই কেন ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন না? কয়েকটি উপায়ে প্রশ্ন সাজানো গেলে তা প্রায়ই ভালো ফল বয়ে আনবে। যেমন, 'এটা কীভাবে ঘটে, তা জানতে পারলে আমি সত্যিই খুশি হব,' অথবা, 'কমিউনিটির সুবিধার জন্যই দয়া করে এই বিষয়টা যদি ব্যাখ্যা করতেন;' এই ধরনের কথাবার্তায় প্রায়ই ইতিবাচক ফল দেখা যায়। তথ্যটা যে জনস্বার্থে প্রকাশিত হওয়া জরুরি, তা বোঝাতে পারলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যদাতারা সাংবাদিকদের সহযোগিতা করেন।

এটা শুধুই একটা কৌশলের বিষয় নয়; 'রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ' বলে একটা বাহারি তকমা আছে সাংবাদিকদের, কিন্তু এটাও সত্য যে সরকারি কর্মকর্তা বা জনসেবকদের কর্মকাণ্ড তদারকির জন্য কোনো সাংবাদিকই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হয়ে আসেন না। সাংবাদিকেরা হচ্ছেন নাগরিক সমাজের অংশ। সেই বিবেচনায় রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করছে কি না, তা নিশ্চিত করার নাগরিক দায় তাঁরা পালন করেন। এই অবস্থায়, সাংবাদিকদের রয়েছে সংবাদপত্র বা গণমাধ্যমের মতো গণযোগাযোগের প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবেশাধিকারের সুবিধা। সাংবাদিকেরা অনেক সময় বৈরী প্রতিষ্ঠান বা দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য গোপন রেকর্ডার ব্যবহারের মতো পদ্ধতির সাহায্য নেন, যাতে এমনকি আইন লঙ্ঘনও হতে পারে। সে কারণেই সন্তোষজনক, আন্তরিকতাপূর্ণ ও স্বচ্ছ (অন্তত যতটা সম্ভব স্বচ্ছ) পদ্ধতি ব্যবহার সাংবাদিকদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনি যেন আপনার দায়িত্বের সীমা লঙ্ঘন না করে ফেলেন, সে জন্য সব সময় নিজেকে এই প্রশ্নগুলো করবেন: যাকে নিয়ে অনুসন্ধান করছি, সেই ব্যক্তি আমি হলে বিষয়টা কীভাবে দেখতাম। আমি সাংবাদিকদের ভূমিকাকে কীভাবে দেখি। আমার নিজের জবাবদিহি কতটা। আমি যে অন্যদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান করছি, এমন প্রলোভন থাকলে আমি কি আত্মসমর্পণ করতাম। কী আমাকে নিবৃত্ত করত। আমার জবাবদিহি ('চেক অ্যান্ড ব্যালান্স') কোথায় ইত্যাদি।

সাক্ষাৎকারের মৌলিক নীতিমালা

বিধি ১ **সময়মতো পৌঁছান**

আপনি দেরিতে পৌঁছালে সূত্রের সঙ্গে আপনার দূরত্ব তৈরি হবে। আপনার নিজের সময় নষ্ট হবে, ক্ষমা চাওয়ার জন্য সময় ব্যয় হবে এবং সাক্ষাৎকারের শুরুতে হয়তো আপনার দম থাকবে না; হাঁপাতে হাঁপাতে মূল বিষয়ে মনোযোগ রাখা সম্ভব হবে না।

বিধি ২ **উপযুক্ত পোশাক পরিধান করুন**

পোশাক পরিধানের নিয়মনীতি এখানে যথেষ্ট শিথিল হলেও প্রথম দর্শনেই আপনার সম্পর্কে সূত্রের একটা খারাপ ধারণা হোক, তা নিশ্চয়ই চাইবেন না। প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিল রেখে পোশাক পরতে পারেন। উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখাবেন। পোশাকে আপনার জীবনাচরণ বা মতাদর্শ সম্পর্কে যেন কোনো বার্তা না থাকে।

বিধি ৩ **কোথায় বসবেন, ঠিক করুন**

আপনার এমন একটা স্থানে বসা দরকার, যেখান থেকে চোখাচোখি ভালো হবে এবং সে রকম জায়গা বেছে নিতে প্রয়োজনে আপনার রেকর্ডিং ডিভাইসকে একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন (যেমন, এটা এই স্থানে রাখলে অধিকতর ভালোভাবে রেকর্ড হবে...)। আবার, একেবারে মুখোমুখি বসলে দুজন দ্বন্দ্বে লিপ্ত, এমন মনে হতে পারে। বরং আপনি সমান্তরালে, বিপরীত স্থানে বসুন। কিন্তু কিছুটা কৌণিক করে বসবেন। দুজনের মাঝে যেন কোনো বস্তু না থাকে, সেটা নিশ্চিত করুন। যেমন, বইয়ের স্তূপ, একটা খোলা ল্যাপটপ ইত্যাদি। নরম সোফায় বসলে লেখার কাজটা কঠিন হয় এবং আরামে গা এলিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।

বিধি ৪ **উপযুক্ত চোখাচোখি বজায় রাখুন**

সামনে থাকা মানুষটার মুখের অভিব্যক্তি দেখতে পেলে সব সময় আলাপচারিতা ভালো হয়। আপনি যদি নোট নিতে থাকেন, তাহলে কিছুটা সমস্যা হতে পারে, কিন্তু মাঝেমধ্যেই তাঁর দিকে তাকানোর চেষ্টা করুন। আর যখন প্রশ্ন করবেন, তখন অবশ্যই তাকাবেন। আপনি কখনোই প্রশ্নমালা টানা দেখে পড়বেন না। সেটা হলে আপনার সূত্র সন্দেহ করবেন, আপনি সাক্ষাৎকার গ্রহণে অত্যন্ত কাঁচা, আপনি আত্মবিশ্বাসী নন অথবা আপনার সূত্র যা বলছেন, তাতে আপনি প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ দিচ্ছেন না। এটাকে আপনার রূঢ় আচরণের আলামত হিসেবেও নেওয়া হতে পারে এবং সূত্র কথা বলায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন।

বিধি ৫ **শারীরিক অভিব্যক্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকুন**

রক্ষণাত্মক অঙ্গভঙ্গি ও চালচলন সংকেত দিতে পারে কৌশলে এড়ানোর চেষ্টাকে। এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন, কোথায় আপনার প্রশ্নটা আরও কঠিনভাবে করা দরকার। আপনার সূত্র কখন আঘাত পাচ্ছে, কখন স্বস্তিবোধ করছে, কখন রসিকতায় মজছে, কখন রাগান্বিত হচ্ছে বা বিরক্ত হচ্ছে– এসব বিষয়েও খেয়াল রাখুন।

বিধি ৬ **অন বা অফ দ্য রেকর্ড**

'অন দ্য রেকর্ড' মানে আপনার সূত্র আপনাকে যা যা বলেছেন, সবই আপনি ব্যবহার করতে পারেন। 'অফ দ্য রেকর্ড' মানে আপনি এই তথ্য কেবল ব্যবহার করতে পারবেন সেসব উপায়ে, যেখানে সূত্রের পরিচয় অপ্রকাশিত থাকবে। আর 'ব্যাকগ্রাউন্ড ওনলি' মানে আদৌ এই তথ্য ব্যবহার করবেন না। এটা কেবলই আপনি যাতে প্রেক্ষাপটটা বুঝতে পারেন, সে জন্য বলা। এই 'অন দ্য রেকর্ড' বা 'অফ দ্য রেকর্ড' মানার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। কিন্তু এটা সাংবাদিক ও সূত্রের মধ্যে একটা সাধারণ সৌজন্য।

এই সাক্ষাৎকার 'অন দ্য রেকর্ড' নাকি 'অফ দ্য রেকর্ড', তা সূত্রের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়ে নিন। সংবেদনশীল বিষয়ের ওপরে প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে সজ্ঞান সম্মতি নিশ্চিত করুন। সাক্ষাৎকারটা যদি অনানুষ্ঠানিক হয়, তাহলে আপনার নোটবুক ও রেকর্ডার বের করে বলুন, 'আমি যদি এই কথোপকথন রেকর্ড করি বা নোট গ্রহণ করি, তাতে তাঁর কোনো আপত্তি আছে কি না।' সাক্ষাৎকারটা যদি আনুষ্ঠানিক হয়, দ্রুত কাজটা সেরে নিন এবং আপনার সময়টার উপযুক্ত ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, নোট নেওয়া বা রেকর্ড করার কথা শুনলে কোনো কোনো সূত্র ভয় পেতে পারেন। রেকর্ডিংয়ের ডিভাইস লুকিয়ে রাখবেন না। জ্ঞাতসারে লিখুন বা রেকর্ড করুন। সূত্র যদি স্নায়বিক চাপ অনুভব করেন, অথবা আপনাকে এটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে ব্যাখ্যা করে বলুন যে এটা কীভাবে আপনার উত্তরগুলো সঠিকভাবে লিখতে সাহায্য করবে।

বিধি ৭ **সব সময়ই নোট নিন**

নোট নিলে মূল বিষয়ের ওপরে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে। এর ফলে অঙ্গভঙ্গি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অভিব্যক্তি নথিভুক্ত রাখতে আপনাকে সাহায্য করবে, যা হয়তো আপনার রেকর্ডারে ধারণ করা সম্ভব নয়। রেকর্ডিংয়ে কোনো সমস্যা হলে এটা একটা ব্যাকআপ হিসেবে থাকবে। সঠিকভাবে নোট নিন, যেন উদ্ধৃতি, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য টানা যায়।

বিধি ৮ **নিরপেক্ষ, উন্মুক্ত প্রশ্ন করুন**

মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে একটা পরামর্শ নিন। এমন প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন, যার উত্তরে আপনার অনুভূতি কী হবে, আগেই তার ধারণা পাওয়া যাবে। এমন প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন: 'এটা কি নিতান্তই ক্ষমতার অপব্যবহারের ঘটনা নয়।' এর পরিবর্তে প্রশ্ন করুন: 'ক্ষমতার এমন ব্যবহারের বিষয়ে আপনার অভিমত কী।' হয়তো আপনি সূত্রের উদ্দেশ্য বুঝতে চাইছেন। কিন্তু সরাসরি 'কেন?' এমন শব্দ ব্যবহার করবেন না। কারণ, এটা হয়তো অভিযোগ তোলা বা অবিশ্বাস বলে মনে হতে পারে। সুতরাং 'কেন' প্রশ্নটা পরোক্ষভাবে করুন। 'গণমাধ্যমের এই খবর আপনাকে কেন ক্ষুব্ধ করল।' না বলে বলুন, 'আপনি বললেন যে গণমাধ্যমের এই খবর আপনাকে ক্ষুব্ধ করেছে। এ বিষয়ে আমাকে আরও কিছু বলুন।'

বিধি ৯ **নীরবতা খারাপ কিছু নয়**

আপনার সূত্রকে প্রশ্নের উত্তর বলতে দিন। পরবর্তী প্রশ্নে যাওয়ার আগে কিছুটা বিরতি দিন। আলাপচারিতায় আপনি শূন্যস্থান পূরণ করতে যাবেন না। যদি সাক্ষাৎকারদাতা একটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে চিন্তার জন্য সময় নিতে চান, নিতে দিন;

আবেগপূর্ণ অবস্থা থেকে বের হতে সময় নিতে চাইলে আপনি অপেক্ষা করুন। পরে শুরু করুন এই প্রশ্ন দিয়ে, 'আমরা কি এখন সামনের দিতে যেতে পারি।'

বিধি ১০ চেহারায় আগ্রহ ফুটিয়ে তুলুন, আগ্রহী হোন

সাক্ষাৎকারের সময় আপনি যা শুনছেন, তার সঙ্গে অব্যাহত মিথস্ক্রিয়ায় থাকতে হবে। উত্তর যা পাচ্ছেন লিখে ফেলুন এবং সেখান থেকে বাড়তি প্রশ্ন বের করুন। নিজেকে প্রশ্ন করুন: আমি যে উত্তর চাই, এটা কি সেটা। আমি কি এটা বুঝেছি। আমি এটাকে কীভাবে ব্যবহার করব। একবার সাক্ষাৎকার নেওয়া শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বারের জন্য সেখানে ফিরে যাওয়া খুবই কঠিন। আপনি যথেষ্ট গবেষণা করে প্রস্তুতি নিয়ে যাওয়ার পর দেখলেন, নানাভাবে চেষ্টা করেও আপনি যা প্রত্যাশা করে আছেন, আপনার সূত্র তা বলছেন না। উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার নেই। বিষয়টি ছেড়ে দিন। অথবা বিষয়বস্তু বদলে নিন। নতুন বিষয়ের দিকে এগিয়ে যান। নতুন প্রেক্ষাপটের ওপর সাড়া দিন এবং ফলোআপ জেনে নিন। আগে থেকে তৈরি হওয়া ধারণানির্ভর বিবরণ বা স্টোরির মধ্যে সূত্রকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। বরং আপনি অপ্রত্যাশিতভাবে যা পেলেন, তা অধিকতর ভালো প্রতিবেদনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। যদি সেটা না হয়, তাহলে আপনি পরবর্তীকালে আপনার আসল বিষয়বস্তুর দিকে ফিরে যেতে পারবেন। আপনার সূত্রের সঙ্গে আগ্রাসী মনোভাব দেখাবেন না। সাক্ষাৎকারটা যদি আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী সঠিক পথে না এগোয়, তবুও নয়। এমনকি সাক্ষাৎকারদাতা রূঢ় আচরণ করলেও নয়।

বিধি ১১ সময়কে শ্রদ্ধা দেখান

ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রাখুন। প্রশ্নের গতি ঠিক রাখুন। প্রতিশ্রুত সময়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলে বলুন, 'আরও কয়েকটি প্রশ্নের জন্য আমাদের কি সময় হবে।'

সাক্ষাৎকারের ইতি টানার সময় এরপরে কী ঘটবে, সে বিষয়ে সাক্ষাৎকারদাতাকে নিশ্চিত করুন। বলতে পারেন, 'এই খবরটা বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে।' তবে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না, যা আপনি রাখতে পারবেন না। যেমন, খবরটা প্রকাশের আগেই তাঁকে দেখার সুযোগ করে দেবেন—এমন প্রতিশ্রুতি।

বিধি ১২ খবর যা, তা-ই বলুন

ভালো সাংবাদিকেরা সূত্র থেকে পাওয়া উপাদানগুলোকে সততার সঙ্গে ব্যবহার করবেন। স্পষ্টতই সাক্ষাৎকারের সময় যা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মিথ্যাচার করা উচিত হবে না। সাক্ষাৎকারের পর কোনো প্রশ্নের বা তার জবাবের অর্থ আপনি উল্টে দিতে পারেন না। কোনো উদ্ধৃতিকে প্রেক্ষাপটের বাইরে নিতে পারবেন না। আসল সাক্ষাৎকারে যে ধারাক্রমে উত্তরগুলো এসেছিল, সেখান থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন। আনাড়িভাবে দুটো বিষয় পাশাপাশি স্থাপনের সময় সত্যটাকে দুর্ঘটনাবশত বিকৃত করে ফেলা খুবই সহজ। আপনার স্টোরিটা বলুন। এরপর স্টোরিটা যাঁদের বিষয়ে, তাঁদের মতামত তুলে ধরুন। পাঠক-শ্রোতা-দর্শকেরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান; সত্যটা কোথায় আছে, তা ঠিকই তাঁরা ধরে ফেলবেন।

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকার কীভাবে ভিন্ন

সব ধরনের সাক্ষাৎকারের জন্যই প্রস্তুতি ও নমনীয়তা দরকার। কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ভিন্ন ধরনের কিছু জিনিস প্রয়োজন হয়, যেটি হয়তো আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার ধরনের ওপরও প্রভাব ফেলবে। কাজের নিজস্ব চরিত্রের কারণে আপনি হয়তো আপনার সূত্রের কাছ থেকে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ পেতে পারেন, কিংবা হয়তো তিনি রক্ষণাত্মক হয়ে যাবেন অথবা আপনাকে এড়িয়ে চলবেন। এখানে থাকছে অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের জন্য এমন কিছু বিবেচ্য বিষয়।

উপযুক্ত সময়জ্ঞান

আপনি অনুসন্ধানের কোন পর্যায়ে গিয়ে ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তিদের মুখোমুখি হবেন। খুব তাড়াতাড়ি হলে তাঁরা আগেভাগেই সতর্ক হয়ে যাবেন, অথবা প্রতিবেদন প্রকাশ ঠেকাতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা আরোপের উপায় খুঁজবেন বা তথ্যপ্রমাণ লুকিয়ে ফেলবেন। আবার খুব দেরিতে হলে তাঁরা হয়তো তার আগেই পালিয়ে যাবেন, আপনার প্রশ্নের একটা সাদামাটা বা চতুর উত্তর তৈরি করে নেবেন, অথবা আপনার প্রশ্নের উত্তর এড়াতে আইনি ফাঁকফোকর বের করে ফেলবেন। তাই আপনার উচিত হবে, কেন্দ্রীয় চরিত্রদের কাছে যাওয়ার আগে যত বেশি পরিমাণে সম্ভব তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা। সেটি বিভিন্ন নথিপত্রও হতে পারে, বা কয়েক জায়গা থেকে নিশ্চিত হওয়া কোনো তথ্যও হতে পারে। এভাবে আপনার হাতে অনেক তথ্যপ্রমাণ আসবে, যার ওপর নির্ভর করে আপনি প্রতিবেদনটি তৈরি করবেন।

সুরক্ষাহীনতা

যদি আপনার স্টোরি পুরোপুরি তৈরি বা সঠিক না-ও হয়, তারপরও আপনি হয়তো 'কিছু একটার ওপরে' কাজ করছেন। এমন পরিস্থিতিতে আপনি মন্তব্যের জন্য অনুরোধ করলে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তদন্ত করছেন, তাঁরা বা ক্ষমতাবান লোকজন সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে সতর্ক করে দেবেন। তাঁরা বুঝতে পারবেন যে আপনি তাঁদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁরা তখন যেকোনো ধরনের পথ অনুসরণ করতে পারেন। সাধারণভাবে অস্বীকার করলে তা মোকাবিলা করা সহজ এবং আপনি আপনার অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারবেন। কিন্তু নানা ধরনের হুমকিও আসতে পারে। যেমন, সরাসরি শারীরিক হামলা, মামলার হুমকি, অথবা তৃতীয় কোনো পক্ষের (প্রায়ই আপনার সম্পাদক বা প্রকাশক) মাধ্যমে ভয় দেখানোর মতো সূক্ষ্মতর কিছু। সংবাদটি প্রকাশের ওপর আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে। আর এসব কিছুর কেন্দ্রে থাকবে 'মানহানি' শব্দটি, যদিও প্রায়শই মানহানির মামলা হয় না।

বিচক্ষণতা

যেসব বিষয় অজানা, সেগুলোকে আলোর মুখ দেখানোই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের লক্ষ্য। হতে পারে অজানা বিষয়টি নিয়ে সবাই ইচ্ছে করে মিথ্যা বলছেন, অথবা জেনেশুনে নীরব থাকছেন। উদাহরণস্বরূপ, দরিদ্র তরুণীদের পাচার নিয়ে একজন মন্ত্রী জাতীয় সংসদে মিথ্যা বলেছেন। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি নন। আপনার অনুসন্ধানের ফলটা সাড়া জাগানো না হলেও চমকপ্রদ হবে। এমন অবস্থায়, তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে হবে অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে। শুরুতেই যদি আপনি সাক্ষাৎকারে যা চাইছেন, তা প্রকাশ করে দেন, তাহলে সূত্র হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাবেন। আপনি যদি সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থানটার কথা প্রচার করেন, তাহলে আপনি হয়তো সাক্ষাৎকারদাতাকে বিপদের মুখে ফেলবেন।

সাক্ষাৎকারের কৌশল ঠিক করা

একটা সাধারণ সাক্ষাৎকারের তিনটা সম্ভাব্য কৌশল রয়েছে। যখন আপনি পটভূমি বা তথ্য নিশ্চিত করার জন্য সাক্ষাৎকার নেবেন, তখন প্রশ্নগুলো খুব একটা কঠিন হবে না। আলাপ এগোতে থাকবে, কিন্তু প্রশ্নগুলো খুব বেশি ধীরে ধীরে আরও সংবেদনশীল বা কঠিন হয়ে উঠবে না। আর কোনো ব্যক্তির জীবন-কর্ম নিয়ে সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে প্রশ্নমালার শুরুটা হবে সেই ব্যক্তির ওপর সংকীর্ণ পরিসরে মনোযোগ স্থাপনের মাধ্যমে; যেমন, তিনি কোন স্কুলে পড়েছেন। কাকে বিয়ে করেছেন এবং কেন। কীভাবে তাঁরা কবিতা লিখতে শুরু করেন। এখানে কিছু কিছু বদ্ধ প্রশ্নও করা হয়, যেখানে সেই ব্যক্তির জীবন সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। কিন্তু আপনার পাঠকেরা সেই ব্যক্তির মতাদর্শের বিষয়েও জানতে আগ্রহী। সুতরাং সাক্ষাৎকারটি যতটা এগোতে থাকবে, ততই তার পরিসর বিস্তৃত হতে থাকবে। আধুনিক উপন্যাসের অবস্থা সম্পর্কে তিনি কী মনে করেন। তিনি কি সাহিত্য পুরস্কারগুলোতে বিশ্বাস করেন এবং তিনি চলতি বছরের মনোনীত ব্যক্তিদের বিষয়ে কী মনে করেন। এই ধরনের সাক্ষাৎকার অনেকটা ট্রাম্পেট (একধরনের বাদ্যযন্ত্র) বাজানোর মতো। এটা সংকীর্ণ একটা পথ দিয়ে শুরু হবে। এরপর ধীরে ধীরে বৃহৎ পরিসরের দিকে যাবে। সাক্ষাৎকার যত এগোবে, ততই বেশি খোলামেলা প্রশ্ন শুরু হবে।

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টো কৌশল নিতে হয়। এটার শুরু হয় বড় ও সাধারণ ইস্যুগুলো দিয়ে (যেমন, সরকারি টেন্ডার প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াটা কী?, এই প্রক্রিয়াটা কি সন্তোষজনক? সরকার কীভাবে এটার ওপর নজরদারি করে?)। আর সাক্ষাৎকার যতই এগোতে থাকে, ততই তা খুঁটিনাটির দিকে মনোযোগী হয়। অনুসন্ধানমূলক সাক্ষাৎকারের চূড়ান্ত ও কঠিন প্রশ্নগুলো প্রায়ই হয় সুনির্দিষ্ট, অনেকটা হ্যাঁ বা না জবাবের মতো (ক্লোজড কোয়েশ্চেন)। যেমন, 'বিশেষ এই চুক্তির ক্ষেত্রে কি আপনি টেন্ডার প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করেছেন। কেন।' আপনি এই প্রশ্নগুলো শেষে করবেন। কারণ, এটা সেই জায়গা, যেখানে আপনার সূত্র হয়তো থেমে যাবে। এরপর তিনি হয়তো আর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইবেন না। এই সাক্ষাৎকারের কাঠামোটা হয় একটা চিমনির মতো। এটা শুরু হয় বড় পরিসরে, কিন্তু শেষ হয় সংকীর্ণ জায়গায়।

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারে করণীয়

উত্তর পাওয়াই জরুরি

আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে সব সময়ই তথ্য পাওয়া; 'বিজয়ী' হওয়া নয়। একটা ঠান্ডা ও শান্তশিষ্ট অবস্থান নিন। আপনার যতটা প্রয়োজন ততটা সময় নিন। সাক্ষাৎকারের কৌশল সব সময়ই হওয়া উচিত তথ্য ও প্রশ্নের উত্তর পাওয়া। আপনার প্রশ্নমালা হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়মাত্র। যেকোনো ধরনের আবেগের বহিঃপ্রকাশ (ভ্রু কোঁচকানো, কাঁধ ঝাঁকানো, মৃদু হাসি) দিলেই তা আপনার সূত্র বুঝতে পারবেন। আপনি একজন মানুষ। আপনার সাড়ায় তার প্রতিফলন থাকতে পারে। আর টিভিতে প্রতিক্রিয়াহীন মুখাবয়ব বিরক্তিকর দৃশ্য তৈরি করে। কিন্তু সতর্ক থাকুন এবং সীমাটা জেনে নিন। হঠাৎ প্রকাশিত কোনো উচ্ছ্বাস সূত্রকে মনে করিয়ে দিতে পারে যে তাঁর বলা শব্দগুলো 'অন ট্রায়াল' রয়েছে। তিনি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকতর সজাগ হয়ে উঠতে পারেন। কোনো বিষয়ে উসকানি মোড় নিতে পারে নাটকীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধ বা নিষ্ফল বর্জনে। আপনার আগ্রাসী আচরণ এতটাই অনুপযুক্ত হিসেবে উপস্থাপিত হতে পারে যে, এর কারণে আপনাকে দেখতে খুবই খারাপ লাগতে পারে। আপনার সাড়াটা যে ইচ্ছাকৃত, সেটা বুঝতে দিন; স্বতঃস্ফূর্ত নয়। মনে রাখুন, কেউ যদি কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পান, তাহলে তাঁর সুযোগ নিয়ে তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে বেঁচে যেতে পারেন।

আসল বিষয়ে যান

আপনার বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের চেয়ে সূত্রের উত্তরগুলোর গুরুত্ব বেশি। সুতরাং প্যাঁচাবেন না এবং হঠাৎ হঠাৎ বাধা দেবেন না। একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিক কিংবা ব্যবসায়ী হয়তো শত শত বা হাজারো সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাঁদের সময়টা অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁরা যদি একটা প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চান, সেটা তাঁরা করবেনই। তাঁরা এটা বোঝেন যে, তাঁরা যেসব সমস্যা সৃষ্টি করেছেন, সেটা যদি আপনি প্রকাশ করে দেন, তাহলে তাঁদের মুখ থাকবে না; অবস্থান ও অর্থ– দুটোই হারাবেন। এমনকি মাঝেমধ্যে পুরো ক্যারিয়ারই নষ্ট হতে পারে। পরিস্থিতি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা ভালোভাবে বুঝে নিন। যদি দেখা যায় নরম বা নমনীয় প্রশ্ন কাজে আসছে না, তাহলে সোজাসুজি বলে ফেলুন। যদি তাঁদের জবাবটা সহজে বোধগম্য না হয়, তাহলে ঢেলে সাজিয়ে ভিন্নভাবে প্রশ্নটি করুন এবং আবার চেষ্টা করুন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সূত্রের চিন্তার জন্য সময় প্রয়োজন হয় এবং আরেকবার উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেলে তাঁরা খুশি হন। সব জবাব সতর্কতার সঙ্গে শুনুন– আপনার জবাব সত্যিই কি পেয়েছেন? আপনার সূত্র যা বলছে, আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিত ধারণা পেয়েছেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে আপনি সেই উত্তরটা তাঁদেরই আবার শুনিয়ে দিতে পারেন (যেমন, আপনি যেটা বলতে চাইছেন, তা হচ্ছে...)।

পূর্ণাঙ্গ উত্তর পেতে যা করতে হবে

আপনার সূত্র যখন যথোপযুক্ত উত্তর দিতে চায় না, তখন তিনি 'সম্প্রতি', 'কয়েকটি', 'অনেক', 'চূড়ান্ত পদক্ষেপ' এ-জাতীয় শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে আপনাকে ফলোআপ প্রশ্ন করতে হবে, যা অধিকতর সুনির্দিষ্ট উত্তর বের করে আনবে। যেমন, 'কখন।', 'কতগুলো।', 'আপনি কি সংখ্যাটা আন্দাজ করতে পারেন।' অথবা 'ঠিক কী করবেন।'

বন্ধ প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে একই কথা। সাক্ষাৎকারদাতা হয়তো একটা প্রশ্নে লাইন টেনে দিতে 'হ্যাঁ', 'না' উত্তর দেবেন। কখনো কখনো আপনার তার চেয়ে বেশি তথ্য লাগবে। তখন সেই প্রশ্নে আবার ফিরতে হবে; যেমন,

'আপনি কি চুক্তিটা সই করেছেন?'

'হ্যাঁ'।

'এটা করার ক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্যটা কি একটু ব্যাখ্যা করে বলবেন?'

প্রতিটি প্রশ্নের জবাব সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করার পরই পরবর্তী প্রশ্নে যান। দক্ষ সাক্ষাৎকারদাতারা হয়তো এমনভাবে সব উত্তর দেবেন, যাতে মনে হতে পারে, আপনি এটাই শুনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন আপনি পুনরায় আপনার নোটগুলো পড়বেন, তখন হয়তো আপনি দেখতে পাবেন যে তাঁরা ধোঁকা দিয়ে আপনার প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন।

আপনি প্রশ্ন করলেন: 'আপনি কি...জেলার ক্লিনিকে ওষুধগুলো পাঠিয়েছিলেন।'

তাঁরা উত্তর দেবেন, 'অবশ্যই, ওই ক্লিনিকের জন্য সব ধরনের উপযুক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে।'

এখানে 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর রয়েছে। কিন্তু আপনি সরাসরি যে প্রশ্নটা করলেন, তার সঠিক জবাব এখানে নেই। আপনাকে তখন ফলোআপ প্রশ্ন করতে হবে: 'কী কী ওষুধ পাঠিয়েছেন।'; 'কোন তারিখে সেগুলো পাঠানো হয়েছে।'; 'সেগুলো যে পাঠানো হয়েছে, এ বিষয়ে আপনার কাছে কোনো প্রমাণ আছে।'; 'সেগুলো যে পৌঁছেছে, এ বিষয়েই-বা আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন।' আপনি যদি সূত্রের কোনো উত্তর বুঝতে না পারেন, সেটি তাঁকে বলুন। বোঝার ভান করার চেয়ে আপনি যে পরিষ্কার বুঝতে পারেননি, সেটা স্বীকার করা ভালো। আপনি বলতে পারেন, 'আমাদের পাঠকেরা/দর্শকেরা এটা হয়তো বুঝতে পারবেন না। এটা কি আরও সহজভাবে আপনি আবার ব্যাখ্যা করবেন?' তা না হলে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করার কৌশল প্রয়োগ করুন: 'মন্ত্রী মহোদয়, আমি যদি আপনার কথা সঠিকভাবে বুঝে থাকি, তাহলে আপনি বলতে চাইছেন...। আসলেই কি তাই।'

কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি ও রেফারেন্স দেওয়া

সাক্ষাৎকারের সময় আপনার কাছে সংশ্লিষ্ট কোনো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, নথিপত্র, গবেষণা-সমীক্ষা বা ছবির কপি আছে কি না, নিশ্চিত হয়ে নিন। সাক্ষাৎকারদাতা অপ্রত্যাশিত কিছু বলতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে আপনি ওই সব নথিপত্র থেকে রেফারেন্স দিতে পারেন। আপনারা টেপরেকর্ডার ও মাথা– দুটোই সচল রাখুন। আলোচনা শেষ হয়ে যাওয়ার পর এগুলোর রেকর্ড ধারণ করা থাকবে। উপযুক্ত মনে হলে ফলোআপ প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি চাইতে হবে।

তোষামোদে ভুলবেন না

এটা একটা সাক্ষাৎকার, বন্ধুত্ব নয়। নতুন তথ্য বের করতেই আপনি এখানে এসেছেন; কারও পৃষ্ঠপোষকতা পেতে নয়। কেউ হয়তো আপনাকে বলবেন: 'এটা দারুণ একটা প্রশ্ন'। এর মাধ্যমে তিনি আপনাকে সম্মান দিচ্ছেন না; বরং উত্তর খুঁজতে বা ভাবতে কিছুটা সময় বের করে নিচ্ছেন।

অনুসন্ধানী সাক্ষাৎকারের পর সূত্রকে অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ করে দিন। আশ্চর্য হবেন, কিন্তু এখান থেকেও নতুন কিছু জানা যায়। এরপর প্রশ্ন করুন, আপনার কাছে তাঁর কিছু জানার আছে

কি না। এটাও একধরনের সৌজন্য। আবার কীভাবে কখন স্টোরিটা প্রকাশ করা হবে, সে বিষয়টা তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করারও একটা সুযোগ। সব সময় এই প্রশ্ন দিয়ে সাক্ষাৎকার শেষ করুন: 'কিছু কি বাদ পড়েছে?' অথবা 'এমন কিছু আছে, যা আপনি যোগ করতে চান?'

শেষ সময়ের সৌজন্য

সাক্ষাৎকারের শেষ বেলায় প্রায়ই দেখা যায়, সূত্র অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য পাচ্ছেন। তিনি অনেক খোলাসা হয়ে উঠেছেন। এই সময়টার সদ্ব্যবহার করুন। সাক্ষাৎকারের সময় কোনো পরিভাষা, শিরোনাম বা নাম এলে সেগুলোর সঠিকতা যাচাই করে নিন। পরবর্তীকালে কোনো তথ্যের বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া লাগতে পারে। এ জন্য ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি চেয়ে নিন। আপনার সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য বা আপনার কার্ড তাঁকে দিন। শেষ সময়ের সৌজন্যকে কখনোই অবজ্ঞা করবেন না। সময় দেওয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আপনি যদি অপদস্থ/অপমানিত হন, তবুও। এমনভাবে কথা বলুন, যেন তিনি বুঝতে পারেন যে আপনার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হওয়ার বিষয়টিকে আপনি সত্যিই প্রশংসা করছেন।

এই সাক্ষাৎকার যদি ঘটনার প্রেক্ষাপট তথ্য পাওয়ার জন্য হয়ে থাকে অথবা ভাবটা খুব বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, তাহলে আপনি সূত্রের কাছে জানতে চাইতে পারেন যে তিনি অন্য কোনো সূত্রের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিতে পারেন কি না, যাঁর কাছে ঘটনার বিষয়ে বাড়তি অন্তর্দৃষ্টি পাওয়া যেতে পারে। এই ব্যক্তির নাম রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারলে হয়তো আপনার সামনে নতুন দরজা উন্মোচিত হবে।

প্রতিশ্রুতি

সাক্ষাৎকার শেষে সরঞ্জাম গোছানোর সময় বা বিদায় নেওয়ার সময়ে বেখেয়াল হয়ে এমন কোনো সুযোগ তৈরি করবেন না, যাতে সাক্ষাৎকারদাতা পরে দাবি করতে পারেন যে স্টোরি প্রকাশ পাওয়ার আগে তাঁকে সেটা দেখতে দিতে আপনি রাজি হচ্ছেন। এ ধরনের আলাপ উঠলে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করুন: 'না, আসলে তা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমি বলব, আপনি যদি আলোচনা করতে চান, তাহলে আমার সম্পাদকের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করা উচিত। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য আপনাকে দিচ্ছি।' গণমাধ্যম বোঝেন এমন ব্যক্তিরা শেষ মুহূর্তে এ ধরনের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকেন। সুতরাং আপনি আচমকা ফাঁদে পা দেওয়ার বিষয়ে সজাগ থাকুন!

সাক্ষাৎকারের পরপরই নোটগুলো যাচাই করুন

সাক্ষাৎকার শেষ হওয়ার পরপরই আপনার নেওয়া নোটগুলো পুনরায় পড়ে নিন। আপনার স্বল্পমেয়াদি স্মৃতিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর এটাই উপযুক্ত সময়। আপনি যদি পরবর্তী দিনের জন্য নোটগুলো ফেলে রাখেন, তাহলে হয়তো অনেক কিছুই ভুলে যাবেন, বিশেষ করে সংক্ষেপে বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে যেসব তথ্য লিখে রেখেছেন সেগুলো। দ্বিতীয়বারের মতো যাচাই করা তখনই জরুরি। আপনার নোটের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে নিন এবং কোন জায়গায় ফলোআপ সাক্ষাৎকার দরকার হতে পারে, তা ঠিক করে নিন।

‘স্পিন ডক্টর’দের কীভাবে সামলাবেন

জনগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাংবাদিকদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে এখন ক্রমবর্ধমানভাবে ‘স্পিন ডক্টর’রা (দাপ্তরিক মুখপাত্র ও জনসংযোগ কর্মকর্তারা) ভূমিকা রাখছেন। মাঝেমধ্যে তাঁরা এমনকি সাক্ষাৎকারেও বসে যান কিংবা কোন বিষয়গুলো আলোচনায় তোলা যাবে না, তার একটা আগাম তালিকা দিয়ে দেন।

যুক্তরাজ্যের গার্ডিয়ান পত্রিকার সাবেক প্রতিবেদক ডেনিস বারকার একজন ব্রিটিশ সরকারি মুখপাত্রের (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) কাছ থেকে ‘স্পিন ডক্টর’দের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত ধারণা পেয়েছিলেন।

১

তাঁরা এমন কিছু অজুহাত দেবেন, যা হয়তো সত্য। কিন্তু সত্য হলেও সেগুলো নিতান্তই অজুহাত এবং আপনি সেগুলো চ্যালেঞ্জ করার অধিকার রাখেন। ‘আপনি যদি না বলতে পারেন, তাহলে কে বলতে পারবেন—এটা হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। প্রায়ই আপনি যে কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করছেন, তাঁরা হয়তো আরেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের অধীনে কাজ করেন। তাই তাঁরা হয়তো সুনির্দিষ্ট তথ্য দেবেন না। অন্যভাবে বললে, তাঁরা যখন মুখে কুলুপ আঁটবেন কিংবা তথ্য না দেওয়ার চেষ্টা করবেন, সেটা নেহাত তাঁদের চাকরির অংশ হিসেবেই করবেন। এটা সেই মুখপাত্রের সমস্যা, আপনার নয়। বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সরকার নিজেদের সমালোচনা হতে দেবে না। মুখপাত্রকে যদি নেতিবাচক বার্তাগুলোর পাশাপাশি কিছু ইতিবাচক বার্তাও তুলে ধরার সুযোগ দেন, তাহলে হয়তো তিনি কিছুটা মুখ খুলতে পারেন।

২

নাগরিক সমাজের সদস্যরা যেসব ইস্যুকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবেন, প্রতিবেদকেরা সেগুলো নিয়েই উদ্বিগ্ন থাকেন। এগুলো যদি সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ না হয়, তাহলে তা অবশ্যই ন্যায়সংগত একটা উদ্বেগ। প্রশ্ন করুন: আপনি কেন এগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন না।’, ‘সরকার কেন এগুলো নিয়ে আরও বেশি চিন্তিত নয়। সরকার যেসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দেবে, প্রতিবেদকের সেগুলো অগ্রাধিকার না-ও হতে পারে। সরকারের হয়তো ‘বৃহত্তর উদ্বেগ’ থাকতে পারে। সরকারের মুখপাত্ররা সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে পড়েন তখনই, যখন সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোতে প্রশ্ন করা হয়, যেগুলো এড়ানোকেই তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব মনে করেন।

৩

ঠিকঠাক জানাশোনা, অভিজ্ঞ ও ঠান্ডা মাথার সাংবাদিকের বদলে আগ্রাসী মনোভাবের নবীন সাংবাদিকদের কথা দিয়ে সন্তুষ্ট করা সহজ। মুখপাত্ররা সব সময়ই আশা করেন, সাধারণ কিছু তথ্যেই প্রতিবেদকেরা সন্তুষ্ট হবেন; বাড়তি আর কিছু চাইবেন না। যখন তাঁরা চিন্তা করবেন, ‘এর ভেতরে কোনো শিরোনাম নেই’, তখন আপনি দেখতে পাবেন, অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গেই তাঁরা তাঁদের আগ্রহের পারদটা নামিয়ে নিচ্ছেন। অন্যভাবে বললে, ‘স্পিন’ কৌশল হচ্ছে এমন: প্রতিবেদকেরা সংবেদনশীল কিছু হন্যে হয়ে খুঁজলে মুখপাত্ররা খবরটার গুরুত্ব কমিয়ে প্রতিবেদকদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। প্রতিবেদকেরা এর ভেতরে কোনটা নতুন তথ্য, তা বের করে সংরক্ষণ করলে ভালো একটা স্টোরি হলেও হতে পারে। এমনকি, সে সময়ে তা বিরক্তিকর মনে হলেও পরে কাজে আসতে পারে।

৪

আপনার তথ্য সঠিক নয় বলা হলেই সেটাকেই সত্য বলে ধারণা করা উচিত হবে না। বরং ‘আমি ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু...’ বলে আপনি আপনার গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফলোআপ প্রশ্ন করুন। আপনার প্রশ্ন ফিরিয়ে দিলে ঘুরিয়ে আবার করুন। কিছু ‘স্পিন ডক্টর’ পাল্টা প্রশ্ন করে আপনার প্রশ্নের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন: ‘মন্ত্রী বিবাহিত। এরপরও কীভাবে তিনি এমন একটা প্রণয়ে জড়িয়ে পড়বেন। আপনারা সাংবাদিকেরা কেন এই ইস্যুতে আটকে থাকছেন? তখন আপনার উচিত হবে বলা—জনাব মুখপাত্র, আপনি অবশ্যই জানেন যে, একজন সাংবাদিকের ভাবনার বিষয়ে কেউ আগ্রহী নয়। পাঠকদের আগ্রহের কারণেই আমি এখানে এসেছি। মন্ত্রীর বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে আমাদের কাছে প্রচুর চিঠি এসেছে। সুতরাং...?

৫

আপনি যদি মনে করেন, উত্তরটা আসেনি। আবার প্রশ্ন করুন: আমি এই উত্তর পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। আপনি কি আবার বিষয়টি একটু বলবেন? অথবা আমি নিশ্চিত নই যে আপনি আমার প্রশ্নটার উত্তর পুরোপুরি দিয়েছেন? উত্তরটা যে সঠিকভাবে আসেনি, তা বোঝানোর ভদ্রোচিত উপায় এটা। আপনি কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চান না?, উত্তর দিতে আপনার বাধা কোথায়?, আপনি যদি আমাকে বলেন, তাহলে কী ঘটতে পারে?, কে আমাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন?

৬

কঠিনতম প্রশ্নগুলোর দিকে যাওয়ার জন্য নানামুখী উপায় ভাবুন: মাঝেমধ্যে জটিল তথ্য জানতে চাওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে সোজাসুজি প্রশ্ন করে ফেলা। কিন্তু যদি আপনি দক্ষ একজন মুখপাত্রের সামনাসামনি হন, তাহলে দেখতে পাবেন, অধিকতর সূক্ষ্ম পন্থাগুলো কখনো কখনো কাজে দেবে। যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি প্রশ্ন করলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা আছে, সেসব ক্ষেত্রে এটা ভালো কাজে দেয়। এখানে কিছু পরামর্শ দেওয়া হলো। তাঁদের কিছুটা সাবধান করে দিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার একটা সুযোগ করে দিন: ‘সম্ভবত এই প্রতিবেদনগুলো আপনি পড়েছেন, যেখানে এই ইঙ্গিত আছে...তাই নয় কি?’, ‘আমি জানি যে, এটা একটা অস্বস্তিকর ইস্যু, কিন্তু আমাদের পাঠকেরা চান, আমি বিষয়টি তুলি...’, ‘ সঠিক তথ্য রেকর্ড করতে আমাকে সাহায্য করুন...’, ‘পার্লামেন্টে বিরোধী দল বলেছে, আপনি...’, ‘আপনি কি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চান।’

স্টোরিতে সূত্রের অস্বীকৃতি জানানোর বিষয়টি লিখুন

কোনো সূত্র আদৌ কথা বলতে না-ও চাইতে পারেন, তাই সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিন। টেলিভিশন বা রেডিওর জন্য রেকর্ডিংয়ে সাক্ষাৎকারদাতার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উত্তর দিতে অস্বীকৃতি শোনা যেতে পারে, যা সম্পাদনার সময়ে আপনি দক্ষভাবে উপস্থাপন করে শুনিয়ে দিতে পারেন। ছাপা কাগজে আপনি লিখতে পারেন, অমুক এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আপনি যা লিখবেন, তাতে জবাব দিতে ব্যর্থ হয়েছেন বলার দরকার নেই, শুধু জবাব দেননি সেটাই জানিয়ে দিন। কেউ কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানালে পাঠকই সে বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে নেবেন।

আপনার যৌক্তিক প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে আপনার সূত্র সরাসরি অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। সে ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো সাক্ষাৎকারটাই বাদ দিতে হতে পারে। মাঝেমধ্যে এটা কাজে দিতে পারে: ‘আমি সত্যিই দুঃখিত, মাননীয় মন্ত্রী। আমি আগে থেকে ধারণা করতে পারিনি যে, এই

ইস্যুগুলোতে আপনার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারব না। অথচ, এগুলোই আমার স্টোরির মূল বিষয়। এখন এ বিষয়ে কেবল আমার পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের মন্তব্যের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। আমি কি এটা বলে দেব যে আপনার পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্য নেই।' এ রকম অবস্থায়, সাক্ষাৎকারদাতা বুদ্ধিমান হলে হয়তো সিদ্ধান্ত নেবেন কিছু বলার। তখন তাঁর মনে হতে পারে, এই প্রতিবেদনে তাঁর কোনো বক্তব্য না যাওয়ার চেয়ে কিছু বলাই ভালো। কিন্তু তাঁরা যদি সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে ভদ্রতার সঙ্গে বিষয়টি ছেড়ে দিন।

আপনাকে আগেভাগেই বলা হতে পারে, নির্দিষ্টভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এরপরও আপনার উচিত হবে সব প্রশ্ন উত্থাপন করা এবং বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা। বিশেষ করে সম্প্রচারমাধ্যমের জন্য এটা সত্য। আপনার সাক্ষাৎকারদাতা এবং পাঠক-দর্শক জানতে পারলেন, অন্তত আপনি প্রশ্নগুলো করেছেন। আপনি যদি সেটা না করেন, তাহলে নিজে সমালোচনার মুখে পড়তে পারেন। সবাই বলবে, আপনি প্রশ্নটা করেনইনি। আপনার সূত্রই হয়তো পরে দাবি করে বসবেন, আপনি প্রশ্নটা করলে তিনি অবশ্যই উত্তর দিতেন। তখন আপনার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে পারে।

বিতর্ক দূরে রাখুন

সাক্ষাৎকারের কোনো পর্যায়ে আপনাকে হয়তো খুবই নাড়া দেওয়া কোনো প্রশ্ন করতে হতে পারে। যেমন আপনার সাক্ষাৎকারদাতার সঙ্গে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সম্পর্ক আছে– এমন অভিযোগ। সে ক্ষেত্রে আপনি এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন: 'আমার এই সাক্ষাৎকারে এখন পর্যন্ত যা পেয়েছি, তাতে পরস্পরবিরোধী ধারণা তৈরি হয়। যেমন...', 'আমার সম্পাদক বলে দিয়েছেন, আমি যেন এই এই প্রশ্নটা অবশ্যই আপনাকে করি...।' গাছে ঝাঁকি মারুন, কিন্তু কখনোই মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না। অথবা, অন্য কোনো সূত্রের পরিচয় বলে দেবেন না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি বলতে পারেন: 'এটা হয়তো আপনি জানতে আগ্রহী হবেন যে অন্য একটি সূত্র আমাকে জানিয়েছেন, তিনি আপনাকে দেখেছেন...', অথবা 'আপনার বিষয়ে একটা গুজব আছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, এই গুজবটা কতটা অনির্ভরযোগ্য'।

গোপন সাক্ষাৎকার

গোপনে রেকর্ড ধারণের বিষয়ে অধিকাংশ গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানেরই কঠোর নীতিমালা রয়েছে। আর কিছু দেশের আইনি বিধিবিধানেই এটা নিষিদ্ধ। সে যা-ই হোক, আপনি যেসব তথ্যপ্রমাণ চাইছেন, তা পাওয়ার জন্য মাঝেমধ্যে হয়তো এটাই হবে একমাত্র উপায়। এ ক্ষেত্রে অনুশীলন অপরিহার্য! আপনি হয়তো আপনার বুকে গোপন ক্যামেরা লাগিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু তাতে যদি শুধু আকাশ বা মেঝের ছবি দেখা যায়, তাহলে সেই ছবি খুব একটা কাজে আসবে না। যদি শব্দগুলো অস্পষ্ট কিংবা শোনা না যায়, তাহলে হয়তো আপনার সময় আর শ্রমটাই নষ্ট হবে। টেলিভিশনের নাটকে যতটা সহজ দেখা যায়, গোপন সাক্ষাৎকার আসলে ততটা সহজ নয়। কারিগরি বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের পাশাপাশি আপনার এমন সাক্ষাৎকার কৌশল জানা থাকতে হবে, যার কারণে লোকজন আপনার সঙ্গে কথা বলতে উৎসাহ পাবেন এবং এমন তথ্য দেবেন, যা আপনার দরকার। না হলে আলাপচারিতা এতটাই কৃত্রিম শোনাতে পারে যে তাতে আপনার কৌশলটা প্রকাশ হয়ে যাবে।

আপনার সূত্র যদি সন্দেহ করেন, আপনি তাঁর কথা গোপনে ধারণ করছেন, তিনি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে তা জানতে চাইতে পারেন। তখন আপনি নিজেকে রক্ষার জন্য মিথ্যা বলতে বাধ্য। এমন পরিস্থিতিতে আপনি গোপনে রেকর্ডের যন্ত্রে ধারণকৃত বক্তব্য ব্যবহারে সমস্যায় পড়বেন। আপনি এই আলাপচারিতা রেকর্ড করার বিষয়টি অস্বীকার করলে আপনাকে আইনি সমস্যায় পড়তে হবে, কেননা আপনি তাঁকে রেকর্ড করা হচ্ছে না—এমন ধারণা দিয়ে কথা বলতে উৎসাহিত করেছেন। জনস্বার্থের বিষয় না হলে ব্রিটিশ গণমাধ্যম আইনজীবীরা এ ধরনের সাক্ষাৎকারের উপাদান ব্যবহারের বিরুদ্ধে। অন্যান্য দেশের আইনজীবীরাও এ বিষয়ে একমত।

অনাগ্রহ ও ভয়ভীতি কীভাবে সামলাবেন

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পাওয়ার পেছনে সাক্ষাৎকারদাতার অনেক যৌক্তিক কারণ থাকে। অনেক দেশেই, 'অবিশ্বস্ত' সংবাদমাধ্যম এবং তাদের এমন তথ্যদাতারা হয়রানির বা আরও খারাপ পরিস্থিতির মুখে পড়েন। তা ছাড়া আপনি যাঁদের সাক্ষাৎকার নিতে চাইছেন, তাঁরা হয়তো একটা মানসিক আঘাতের মধ্য দিয়ে গেছেন। এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের অনীহা থাকতে পারে। অথবা সেসব একান্ত তথ্য প্রকাশ করলে নিজস্ব জনগোষ্ঠীর ভেতরে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তাঁদের চিহ্নিত হওয়ার ভয় থাকতে পারে। মৃদু অধ্যবসায় হয়তো কখনো কখনো কাজে দিতে পারে। তবে সবচেয়ে ভালো হয়, আপনি যদি কাউকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। সেটা করতে পারলে অনাগ্রহী একজন সূত্রও কথা বলতে রাজি হতে পারেন।

সূত্র কিসে ভয় পান, সেটা আগে খুঁজে বের করুন। সাক্ষাৎকার নেওয়ার বিষয়ে তাঁকে যতটা সম্ভব আপনি আশ্বস্ত করুন। এর অর্থ হতে পারে, তাঁকে কী ধরনের সুরক্ষা দেওয়া যাবে, সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগে সে বিষয়ে আপনার সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনা করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া। কারণ, এমন কোনো প্রতিশ্রুতি আপনার দেওয়া উচিত নয়, যা আপনি পরে রাখতে পারবেন না।

প্রকাশের জন্য সজ্ঞান সম্মতি নিন

'সজ্ঞান সম্মতি' একটা গভীরতর বিষয়। এটা নেহাত আপনার সূত্রকে এই প্রশ্ন করে নেওয়া নয় যে, 'আপনি যা বললেন, তা যদি আমরা প্রকাশ করি, তাতে আপনার কোনো আপত্তি আছে কি না।' এর অর্থ, আপনার সূত্র তা প্রকাশের সম্ভাব্য পরিণতি ও ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, আপনার প্রদত্ত সুরক্ষাগুলো কাজে দিতে পারে (আবার না-ও পারে)। তিনি এগুলো পুরোপুরিভাবে জ্ঞাত হয়েই তা প্রকাশে সম্মতি দিয়েছেন। মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলবেন না। তবে সম্ভাব্য পরিণতির বিষয়টিও তাঁদের কাছে লুকাবেন না। মানুষজন যত বেশি তথ্য দেবেন এবং তা প্রকাশের বিষয়ে সম্মতি দেবেন, আপনার প্রতিবেদন তত বেশি শক্তিশালী হবে। এ ধরনের আলাপচারিতা সূত্রের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে আরও নিবিড় করতে সহায়তা করবে এবং তাতে আরও বেশি ফলদায়ক আলাপচারিতা পাবেন। যদি কিছু পরিচয় গোপনও করতে হয়, তারপরও এটা কাজে দেবে।

সহমর্মিতা নয়, সহানুভূতি

'ওহ্, কতটা ভয়ংকর! আপনার এমন খারাপ অবস্থা!' এমন কথা কখনো বলবেন না। এ ধরনের কথা আপনার সূত্রের আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাবে। তিনি হয়তো তখন দুর্বল ও অসহায় বোধ করবেন। সাক্ষাৎকারদাতাকে তাঁর কাহিনিটা বলার জন্য একটা নিরাপদ জায়গা করে দিন। যেটা দরকার সেটা হচ্ছে, একটা নিরপেক্ষ, খোলাখুলি শোনার ধরন ও যথেষ্ট সময়, যাতে করে সেই ব্যক্তি চিন্তা করার সময় পান এবং নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। নিয়মিতভাবে উৎসাহমূলক সাড়া দিন। সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলুন, 'ঠিক আছে, বলুন...', অথবা 'আমাকে আরও কিছু বলুন'। সংস্কৃতিগতভাবে যদি উপযুক্ত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির বাহু মৃদু চাপড়ে দিয়ে আশ্বস্ত করতে কোনো দোষ নেই। এক কথায়, আপনার মানবিক প্রবৃত্তি অনুসারে আপনি চলবেন।

লেখা থামান

আপনার সূত্র হয়তো নিবিষ্ট মনে কথা বলছেন। এর ভেতরেই আপনি নোট নিয়ে চলেছেন। এটা সূত্রের কাছে খারাপ লাগতে পারে। প্রশ্নমালা যদি সংবেদনশীল জায়গায় গিয়ে পৌঁছায়, তাহলে কেবলই শুনতে থাকুন। আপনি পরেও নোট লিখতে পারবেন।

শ্রদ্ধা দেখান

তড়িঘড়ি করে একের পর এক প্রশ্ন করে যাবেন না। সূত্রের কোনো উত্তরকে উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলার মাধ্যমে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সব সময় আপনি সূত্রের আয়নায় নিজেকে দেখবেন। এটা নিশ্চিত করুন যে আপনার প্রশ্নগুলো অসংবেদনশীল নয়।

কঠোর হোন

আপনি সংবেদনশীলতা অবশ্যই মাথায় রাখবেন। কিন্তু এরপরও আপনাকে কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন করতে হবে। কেউ হয়তো আপনাকে বলবেন যে তিনি নির্যাতনের শিকার। এর অর্থ এই নয় যে সেটা অবশ্যই সত্য। যেসব মানুষ ঘটনা অতিরঞ্জিত করতে পারেন, তাঁদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। এটা স্পষ্ট করে বলুন যে তাঁদের ঘটনাটা সত্য, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের দুর্ভোগ বা ভোগান্তির বিষয়ে কিছু করা যাবে না। অন্যান্য সাক্ষাৎকারের বেলায় আপনি যেমন কয়েকটি মাধ্যমে তথ্য যাচাই করে নেন, এমন ক্ষেত্রেও অবহেলা করবেন না।

সঠিক প্রশ্নটি করা না-করার ওপরে নির্ভর করে, প্রতিবেদন হবে কি হবে না। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে: আপনি কীভাবে সেই গল্পটি পাঠকের সামনে সহজবোধ্য আকারে হাজির করতে পারছেন। একটা আকর্ষণীয় সংবাদ প্রতিবেদন লেখার জন্য আপনি সংগৃহীত তথ্য কীভাবে বাছাই করবেন, তা নিয়ে আলোচনা থাকবে পরের অধ্যায়ে।

অধ্যায় ৮

৮ প্রতিবেদন লেখা

চমৎকার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে, যদি লেখা গোছানো এবং ভালো না হয়। প্রতিবেদনটি অবশ্যই পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে, তাই তথ্য হতে হবে হালনাগাদ ও সময়োপযোগী। তার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে আরও গুরুত্ববহ করে তুলবে, প্রতিবেদনের ওজন বাড়াবে। গ্রাফ, চার্ট ও ডায়াগ্রামের ব্যবহার পাঠককে প্রতিবেদনের জটিল বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

প্রতিবেদন লিখবেন কীভাবে

কোনো প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাঠকদের মনে প্রভাব ফেলতে চাইলে আপনাকে এর মূল বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সবচেয়ে শক্তিশালী চিত্রটি তুলে ধরতে হবে। পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করার বিষয়ে জ্যেষ্ঠ মার্কিন সাংবাদিক স্টিফেন ফ্রাঙ্কলিনের পরামর্শ হলো, শুরুতেই অত্যন্ত ব্যক্তিগত বিষয়কে প্রাধান্য দিন, যাতে একটা জোরালো সূচনার ছবি পাওয়া যায়। প্রথমে জানানো উচিত শুধু ন্যূনতম মৌলিক তথ্য, যার বিস্তারিত পরে আপনি খোলাসা করবেন। তবে যা খুঁজে পেয়েছেন, সেটি সততার সঙ্গে লেখাও জরুরি। প্রতিবেদনের সঙ্গে যায় না এমন বিষয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না কিংবা ঘটনাকে চাঞ্চল্যকর প্রমাণ করার প্রচেষ্টায় যাবেন না। পাঠকের বিশ্বাস অর্জনের বিষয়টি আপনার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই আপাতদৃষ্টিতে অসত্য বলে মনে হয়, এমন বর্ণনা দিয়ে শুরু করলে আপনার পুরো উদ্যোগই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

তথ্যগুলো দেওয়ার পর আপনার অনুসন্ধানের উদ্‌ঘাটনগুলো সংক্ষেপে জানিয়ে সেগুলোর প্রমাণ তুলে ধরুন। শব্দচয়নে অসতর্কতা বা তথ্যপ্রমাণের সংযুক্তিতে দুর্বলতা রেখে প্রতিবেদনটি খেলো বানিয়ে ফেলবেন না। এমন করলে, যদি ভাগ্য ভালো থাকে, দেখা যাবে, প্রতিবেদনটি নিরেট হয়নি। আর সবচেয়ে খারাপ হলে দেখা যাবে, এটি মানহানিকর হয়ে গেছে এবং তাতে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হতে পারে।

মনে রাখার মতো কয়েকটি বিষয় এখানে:

হতে হবে নির্ভুল

- **বর্ণনা ও উদাহরণ :** আপনার পাঠকদের জন্য পেশাজীবীদের ব্যবহৃত বিশেষ ভাষা ও জটিল বিশেষণের ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং প্রতিবেদনজুড়ে একই ব্যাখ্যা বজায় রাখতে হবে। এ ছাড়া উদাহরণের মাধ্যমে এসব জটিল শব্দকে বোধগম্য করতে হবে।
- **অপ্রমাণিত বিষয়ের সরলীকরণ :** 'সর্বাধিক', 'অনেক', 'কিছু' বা 'কয়েকটি'— এমন শব্দগুলোর পার্থক্য ও অর্থ বুঝতে হবে। যথাযথভাবে শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে হবে। 'সর্বাধিক' ও 'অনেক'-এর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে অতি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং 'সবাই' বা 'কেউ না' এর মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে আরও সাবধানী হতে হবে। কোনো কিছু কি 'একমাত্র কারণ' নাকি 'অনেকগুলো কারণের একটি'? এটা কি 'সব সময়ই' নাকি 'প্রায়শই'? বাস্তব উদাহরণ ও নাম উল্লেখ করা ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি দিয়ে বিষয়গুলো সহজভাবে বোঝাতে হবে।
- **যুক্তিকে শক্তিশালী করুন :** সাবধানতার সঙ্গে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দিয়ে সব বক্তব্য-বিবৃতির যুক্তিগুলো তুলে ধরুন। যখন আপনার একটি ধারণা বা আইডিয়াকে সমালোচনা করার কথা, তখন কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করবেন না। তথ্য ও যুক্তি দিয়ে আলোচনার মধ্যেই থাকুন। কোনো সুবিধা নেওয়ার বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রভাব ফেলেছে কি না, তা পাঠককেই ঠিক করে নিতে দিন। কখনো কখনো তথ্যপ্রমাণগুলোই আপনার হয়ে কথা বলবে।

প্রমাণ হিসেবে কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি : কোনো বিষয়ে ভালো ও মন্দগুলোর তালিকা করুন এবং সেগুলো ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রাখুন। কর্তৃপক্ষের নেওয়া পদক্ষেপের পেছনের কারণগুলোতে মনোযোগ দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। কেউ কিছু বললে তা কেন বলেছেন, সেটা বোঝা দরকার। ঘটনার পটভূমি এবং উদ্ধৃতির জন্য একটি উৎস নয়, বরং প্রাসঙ্গিক একাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলুন, গবেষণা করুন।

সংস্কার, গৎবাঁধা বা আবেগ : ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক—গৎবাঁধা ভাষা এড়াতে হবে এবং তা হতে হবে নিরপেক্ষ। আর সব সূত্রকে সমান সংশয়ের চোখে দেখুন।

জিজ্ঞাসা করা, 'তাহলে কী' : আপনার হাইপোথিসিসের সঙ্গে কোনো তথ্য প্রাসঙ্গিক কি না, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার একটি ভালো উপায় নিজেকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, 'তাহলে কী'। একটিমাত্র সহায়ক বা সমর্থনসূচক প্রমাণের বদলে বেশি সাক্ষ্য ও নজির দিতে পারলে তার গুরুত্ব অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে। আপনার কাছে অনেক বেশি সাক্ষ্য ও নজির থাকলে সেগুলোকে স্পষ্ট করুন এবং বাহুল্য বর্জন করুন। এমনকি, আপনি আবারও সূত্রের কাছে ফিরে গিয়ে বিষয়গুলোর আরও বিশদ ব্যাখ্যা জানতে চাইতে পারেন। আপনি হয়তো পটভূমিটাও আগেভাগে ব্যাখ্যা করে দিতে চাইবেন। এতে করে ঘটনার সময়কার পরিবেশ-পরিস্থিতি ও ফলাফল সম্পর্কে পাঠকদের আরও ভালোভাবে ধারণা দেওয়া সম্ভব। এ ছাড়া আপনি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, তাদের সে রকম কাজে জড়িত হওয়ার কারণ, উদ্দেশ্য এবং সুযোগ ছিল কি না, সে বিষয়েও তথ্য যুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ সাজিয়ে লেখা

আপনার প্রতিবেদনটি চিন্তা করুন বেশ কয়েকটি পর্বের সমষ্টি হিসেবে। এবং প্রতিটি পর্বে থাকবে বেশ কিছু অনুচ্ছেদ। এই পর্বগুলোতে (যেমন: একটিতে জাতীয় কেলেঙ্কারির প্রধান কুশীলবদের নিয়ে কথা বলা হয়েছে, একটিতে গুপ্ত সংগঠনের ইতিহাস ও তাদের গড়ে ওঠা নিয়ে আলাপ করা হয়েছে) আপনার পুরো অনুসন্ধানটির একেকটি দিক উঠে আসবে। এবং সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে। এভাবে আপনি একটি বৃহৎ দৃশ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করতে পারেন। এতে আপনার পাঠকের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে। এটি একটি 'মূল বাক্য' দিয়ে শুরু হয়, যা পাঠককে বোঝায়, কোন দিকটি আপনি তুলে ধরতে চাইছেন অথবা আগে যা ঘটেছে, তার সঙ্গে এটি কীভাবে সম্পর্কিত। প্রতিটি অনুচ্ছেদে নিচের বিষয়গুলো থাকা উচিত:

(১)	তথ্যপ্রমাণ (বিস্তারিত, বিবৃতি, যুক্তি, সংখ্যা)
(২)	সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা
(৩)	প্রসঙ্গ, ইতিহাস, তুলনা বা পার্থক্য
(৪)	কারণ কিংবা প্রভাব
(৫)	পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি
(৬)	ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ বা পরামর্শ

দৈনিক পত্রিকায় কাজ করা সাংবাদিকেরা প্রায়শই অনুচ্ছেদ করে গল্প লেখার শৈশবের অভ্যাসটি ভুলে যান। এর কারণ হলো, পত্রিকাগুলো খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁদের করা অনুচ্ছেদে প্রতিবেদন ছাপে। সহসম্পাদকেরা লাইন বাড়ানোর জন্য অনুচ্ছেদ ভেঙে ফেলেন অথবা কয়েকটি অনুচ্ছেদ একত্র করে জায়গা বাঁচান। এ নিয়ে চিন্তা করবেন না। প্রতিটি প্রতিবেদনকে দাঁড় করানোর জন্য অনুচ্ছেদ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। পরিকল্পনা করুন এবং সেই অনুযায়ী অনুচ্ছেদ করে লিখুন। বিন্যাসের বিষয়টি নিয়ে সহসম্পাদকদের ভাবতে দিন।

উদ্ধৃতি ব্যবহার

পুরো কাহিনি বলার জন্য নয়, বরং কোনো যুক্তির জন্য উদ্ধৃতি ব্যবহার করুন। তা যেন আবার একই কথার পুনরাবৃত্তি না করে, বরং বাড়তি তথ্য জানায়। তবে মৌলিক ও প্রকৃত তথ্য দেওয়ার জন্য উদ্ধৃতির ব্যবহার না করাই ভালো। সূত্র আপনাকে যা বলেছে, তা বিশ্লেষণের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং গল্পকে আরও বর্ণিল করতে এবং সূত্রের সঙ্গে আপনার কথোপকথন দেখাতে উদ্ধৃতি ব্যবহার করুন।

আপনাকে মানুষ যা বলেছে, হুবহু সেই শব্দগুলো ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমগুলো হলো:

- কোনো ব্যক্তি এমন কিছু বলেছেন, যা বোঝা কষ্টকর অথবা তাঁকে উপহাসের পাত্রে পরিণত করতে পারেন এবং তাঁর বক্তব্যের 'সপক্ষে' কিছুই যুক্ত করে না।
- অবমাননা ও অশ্লীলতার বিষয়গুলো যদি আপনার প্রকাশক অনুমোদন না করেন।
- 'দেখুন', 'আপনি জানেন', 'আমি মনে করি' জাতীয় কথার কথা। শব্দগুলো অপ্রয়োজনীয় এবং কোনো কিছুই যুক্ত করে না।

সব উদ্ধৃতিতে বক্তার পরিচয় দিন এবং নিজে যা দেখেননি, তার বিবরণে সূত্রকে উদ্ধৃত করুন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে সূত্রের পরিচয় দিয়ে উদ্ধৃতি প্রকাশ অন্য সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি। কারণ, আংশিকভাবে হলেও পাঠকেরা সূত্র দেখেই আপনার তথ্যপ্রমাণের মূল্য বিচার করবেন। এ ছাড়া প্রতিবেদনে কোনো নতুন বক্তার কথা ব্যবহারের আগে তা পরিষ্কারভাবে জানান। যদি কোনো কারণে বক্তার পরিচয় জানাতে না পারেন, তাহলে তাঁর কারণ ব্যাখ্যা করুন: যেমন, সাক্ষাৎকারদাতা বলেছেন, 'আমি এই বিষয়টি দেখিয়েছি জানলে কোম্পানি আমাকে বরখাস্ত করবে।'

উদ্ধৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বাছাই ও উপস্থাপন

- একটি উদ্ধৃতির আগের লাইনটি পাঠককে যেন বুঝতে সাহায্য করে যে পরবর্তী সময়ে কী আসছে।
- উদ্ধৃতির জন্য আপনার উপস্থাপনার বার্তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।
- উদ্ধৃতির বর্ণনায় 'তিনি বলেন' কথায়ই থাকুন। অন্যান্য শব্দ ('দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন', 'দাবি করেন', 'যুক্তি দেন') হয়তো অপ্রয়োজনীয় জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে বা ('খণ্ডন', 'প্রত্যাখ্যান') এমন শব্দের ব্যবহারের কারণে পাঠক ভুল বুঝতে পারেন। শুধু যথাযথ বলে নিশ্চিত হলেই লেখায় একটা বাড়তি স্বাদ যুক্ত করতে কোনো নির্দিষ্ট বিশেষণ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আপনি যখন তা অন্য কথায় প্রকাশ করবেন, তখন কোনো প্রলেপ দেওয়ার জটিলতায় যাবেন না। মূল উৎসের অর্থ ও সুর ঠিক রাখুন। যদি কোনো মুখপাত্র বলেন, 'আমাদের বাজেট নেই,' এটি অন্য কথায় প্রকাশের ক্ষেত্রে বলবেন না যে, 'তিনি বলেছেন, তাঁর প্রতিষ্ঠান এই খরচের জন্য প্রস্তুত নয়', যা আসলে শুধু আর্থিক অবস্থা না বুঝিয়ে মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়।

খসড়া শেষ, আবার লিখুন

এই পর্যায়ে, আপনার সব উপাদান কোন অংশে কীভাবে যাবে, তা বাছাই এবং সব উদ্ধৃতি ও গবেষণার তথ্য সাজানোর ধারণা ঠিক হয়ে গেছে। এখন আপনার প্রথম খসড়াটি লেখার সময়। অনেকেই প্রথম খসড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে ভুল বোঝেন। এটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন নয়, তাই চূড়ান্ত বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। বরং এটি হলো একটি নকশা, যা আপনাকে প্রতিবেদনটি কেমন দেখাবে বুঝতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে আরও কিছু কাজ করতে হবে কি না, তা বুঝতেও এটি সহায়তা করে। এই পর্যায়ে, আপনার মার্জিত ভূমিকা, পরিচ্ছন্ন সমাপ্তি বা পরিশীলিত ভাষা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এখানে আপনি লিখছেন, সম্পাদনা করছেন না। আপনি যা করছেন তা হলো, আপনার সব তথ্য-উপাত্ত বা লেখার মালমসলা একসঙ্গে কাগজে লিখে রাখছেন।

প্রতিবেদনের গঠন ও শৈলী

অনুসন্ধানমূলক, নিরেট সংবাদ বা ফিচার—যা-ই হোক না কেন, প্রতিবেদনের জন্য মূলত তিনটি মৌলিক কাঠামো আছে:

(১) সময়ানুক্রমিক : যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেদনটি ফুটে ওঠে, আর ক্রম ও ক্রিয়া এখানে তদন্তের উপাদান

(২) বর্ণনামূলক : নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি পরিস্থিতি অনুসরণের মাধ্যমে ঘটনা উন্মোচনের বিবরণ তুলে ধরে

(৩) প্রক্রিয়াগত : যেখানে প্রতিবেদন এগিয়ে চলে বিষয় ও যুক্তিগুলো ঘিরে

সমস্যা বা ইস্যু, কে বা কারা ক্ষতিগ্রস্ত, বিরোধ বা সংঘাত এবং আপনার অনুসন্ধানে পাওয়া বিষয়গুলো বাছাই করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে আপনি লেখা শুরু করুন। তুলনামূলকভাবে সহজ ও সংক্ষিপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে, কয়েক মাস বা বছরের বদলে যেটি কয়েক সপ্তাহেই শেষ হয়ে যায়, সেগুলোর ক্ষেত্রে ভূমিকা, উপসংহারসহ এই অংশগুলো আপনার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য সন্তোষজনক একটি ছক তৈরি করে দিতে পারে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখায় সাহিত্যিক নৈপুণ্য দ্বিতীয় স্থানে থাকে। কেন্দ্রে থাকতে হবে তথ্য-উপাত্ত। যেকোনো ক্ষেত্রে একটি ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নিজে থেকেই লেখা হয়ে যায়। আপনাকে খুব বেশি সাজসজ্জা বা নাটকীয় রূপ দিতে হয় না।

অন্যান্য তাৎক্ষণিক প্রতিবেদনের তুলনায় অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দীর্ঘ ও জটিল হয়। তাই একে নির্দিষ্ট গঠন ও কাঠামোর মধ্যে নেওয়া হলে আপনার পাঠকদের জন্য জটিল বিষয় বুঝে নেওয়ার পথ তৈরি হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বহুল প্রচলিত তিনটি কাঠামো:

(ক) **'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'** ফর্মুলার মধ্যে আছে

১. একজন ব্যক্তি বা একটি পরিস্থিতি নিয়ে শুরু করে সেই কেসের সঙ্গে প্রতিবেদনের মূল বিষয়ের যোগসূত্র তৈরি।

২. একটি নাট গ্রাফ বা প্রতিবেদনের সারাংশের মাধ্যমে স্বতন্ত্র ঘটনা বা কেইস থেকে বৃহত্তর সমস্যার দিকে যাওয়া। এখানে নাট গ্রাফই ব্যক্তির সঙ্গে বিষয়বস্তুর সংযোগ তৈরি করবে।

৩. যে ব্যক্তির কথা দিয়ে শুরু হয়েছিল, সেই ঘটনায় বা কেস স্টাডিতে ফেরা ও উপসংহার টানা।

(খ) **'হাই ফাইভস'** পদ্ধতি তৈরি করেছেন লেখনশৈলীর মার্কিন প্রশিক্ষক ক্যারল রিচ। তাঁর প্রস্তাব করা পাঁচটি বিভাগ:

১. মূল খবর (কী ঘটেছে বা ঘটছে)
২. প্রসঙ্গ (পটভূমি কী)
৩. ব্যাপ্তি (এটি কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, স্থানীয় প্রবণতা নাকি জাতীয় সমস্যা)
৪. সীমা (এটি কোথায় নিয়ে চলছে)
৫. প্রভাব (আপনার পাঠকেরা কেন এটিতে গুরুত্ব দেবেন)

পাঁচটি বিষয় একত্র করতে এই কাঠামোতে রূপান্তরমূলক লেখায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। এটি না হলে, মনে হতে পারে পাঁচটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন একের পর এক আসছে। কিন্তু ওয়েবসাইটের দীর্ঘ প্রতিবেদনের জন্য এ রকম কাঠামো হতে পারে। সেখানে দীর্ঘ বর্ণনাকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়, যেন পাঠকেরা স্বচ্ছন্দে ধীরে ধীরে পড়তে (ব্রাউজ করতে) পারেন।

(গ) পিরামিড

নিরেট সংবাদ প্রতিবেদনের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি হলো 'উল্টো পিরামিড কাঠামো' (মূল বিষয়গুলো শুরুতে, পরে কম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক সব বিষয়)। অপর দিকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পিরামিড কাঠামোর সঠিক দিকটি ওপরে নিয়ে আসে। আপনার পুরো প্রতিবেদন মূল বিষয়ের দিকে নিয়ে যাবে। আপনার উদ্‌ঘাটন করা বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে পাঠককে সেই মূল কথা বা উপসংহারে নিয়ে যেতে হবে।

১. প্রতিবেদনের মূলভাবের সংক্ষিপ্তসার দিয়ে শুরু করুন।

২. আপনি যা উদ্‌ঘাটন করবেন, তার কিছুটা পূর্বাভাস দিন।

৩. ধাপে ধাপে আপনার অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলুন, টেনশন জিইয়ে রাখুন এবং গল্পটিকে সবচেয়ে চমক দেওয়া বা নাটকীয় উদ্‌ঘাটনের দিকে নিয়ে যান; ঠিক যেন কোনো বৈজ্ঞানিক সাফল্য অথবা রহস্য-উপন্যাসের মতোই।

৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নাটকীয় তথ্যটি সবশেষে বলার জন্য তুলে রাখুন।

এই প্রতিটি সূত্র বা প্রণালিতে উপন্যাস রচনার কলাকৌশল থেকে কিছু ধার নেওয়া হয়েছে। তাই আপনি উপন্যাস সৃষ্টি না করলেও সাহিত্যের কিছু কৌশল প্রয়োগ করছেন। এটি সহজেই বোঝা যায়; কারণ, প্রত্যেক সাংবাদিকই একজন কাহিনি রচয়িতা। শুধু ভালো নয়, সত্য কাহিনির রচয়িতা হিসেবে নিজেকে দেখাই হলো সংবাদ লেখার আধুনিক পদ্ধতির ভিত্তি, যাকে আমরা বলি বর্ণনামূলক সাংবাদিকতা।

মার্কিন গণমাধ্যমে ইরাক যুদ্ধের কাভারেজ নিয়ে 'উইপনস অব মাস ডিসেপশন' নামে চলচ্চিত্রে একধরনের সতর্কবাণী দিয়েছেন সে দেশেরই অনুসন্ধানী সাংবাদিক ড্যানি স্কেচটার। তিনি গল্প বলার এই কাঠামোর একটি বড় সমস্যা তুলে ধরেন: বর্ণনামূলক ধারায় ব্যক্তির একক গল্প বলতে গিয়ে, অনেক বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও বিতর্ককে অগ্রাহ্য করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো। তবে তার মানে এই নয় যে, গল্প বলার বর্ণনামূলক ধারা খারাপ; বরং এটি মনে করিয়ে দেয়, অন্য যেকোনো লেখার পদ্ধতির মতোই গল্পকথনের (স্টোরিটেলিং) ধরনও সঠিক প্রেক্ষাপটে, সচেতনভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

বর্ণনামূলক সাংবাদিকতার কিছু কলাকৌশলের মধ্যে আছে:

প্রতিকৃতি ও দৃশ্যায়ন: ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের পদ্ধতিটি বেছে নিলে অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াজুড়ে সব খুঁটিনাটির ওপর আপনাকে গভীর নজর রাখতে হবে। অবশ্যই মূল উৎস বা দৃশ্যের বর্ণনা এমনভাবে দিতে হবে, যেন পাঠকেরা একে বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন। এর অর্থ আবার এই নয় যে, সবকিছুর বিরক্তিকর বর্ণনা দেবেন (জায়গার সংকট তো আছেই), বরং বেছে বেছে কিছু জাজ্বল্যমান বিবরণ নির্বাচন করুন, যা আপনার প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করবে।

ইঙ্গিত ও আভাস: অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সময়, আপনার গল্পটি পাঠকদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, এ সম্পর্কে শুরুতেই তাঁদের ইঙ্গিত বা ধারণা দেওয়াও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে আপনি যখন পিরামিড কাঠামো অনুসরণ করেন। গল্পের শেষে চূড়ান্ত সত্য উন্মোচনের আগ পর্যন্ত একটু একটু করে বিবরণ জানাতে থাকবেন, যাতে পাঠককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যায়।

গতি, কাঠামো ও শব্দ: লেখার ক্ষেত্রে গতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণনার প্রতিটি পর্যায়ে যে ধরনের কাঠামো ও শব্দ আপনি বাছাই করেন, তা-ই ঠিক করে দেয় আপনার প্রতিবেদন কতটা দ্রুত বা ধীরে এগোবে। সংক্ষিপ্ত বাক্য ও শব্দ গতি বাড়ায়। দীর্ঘ বাক্য এর গতি কমিয়ে দেয়। বাক্য ছোট হলেও একটি নিরেট অনুচ্ছেদে বিপুল পরিমাণ কারিগরি তথ্য পাঠকদের ধীরে যেতে বাধ্য করবে। অপ্রয়োজনীয়, বাড়তি পটভূমি আপনাকে গল্প শেষ হওয়ার অনেক আগেই তার গতি রুদ্ধ করে দেবে। সব সময়ই নিজেকে জিজ্ঞেস করুন: এটির কি কোনো মূল্য আছে, নাকি নিছক কিছু বাড়তি শব্দ যোগ করছে। প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজন নেই এমন কথা বাদ দিন।

নিজের প্রতিবেদনটি শব্দ করে পড়লে আপনি বর্ণনার গতি ও প্রবাহ বুঝতে পারবেন। আরও বুঝবেন গল্পটি কোথায় গিয়ে ধীর হয়ে গেছে, অথবা আরও খারাপ হলে, কোথায় একঘেয়ে মনে হচ্ছে। আপনার কানই সবচেয়ে ভালো সম্পাদক এবং এটিই আপনাকে বলবে, কোথায় আপনি লেখক হিসেবে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর হারিয়েছেন অথবা কোথায় আপনার ভাষা দীর্ঘসূত্রতায় জড়িয়ে গেছে কিংবা জটিল ও ভুল হয়েছে। প্রতিবেদনটি কথোপকথনের মতো করে লিখুন, যেন আপনি কাউকে গল্পটি বলছেন। এতে পাঠকেরা আপনার কথার সুর বুঝতে পারবেন। সঠিক ব্যাকরণ ও বিরামচিহ্ন লেখার মধ্যে সুর, শব্দের ওপর জোর ও সূক্ষ্ম তারতম্য যোগ করে। কথা বলার সময় হাত, চোখ ও মুখের পেশি যে কাজ করে, এগুলোও কাগজের ওপর সেই কাজটি করে।

ছবির মতো করে চিন্তা

বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় চিত্র ও নাটকীয় মুহূর্ত খুঁজে পাওয়ার একটি পদ্ধতি হলো ছবির মতো করে চিন্তা করা। বিন্যাস ও নকশা আপনার দায়িত্বের মধ্যে না পড়লেও চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জন্য যেসব ছবি ও চিত্র প্রয়োজন হবে, আপনি সেগুলো নিয়ে চিন্তা করুন। এমনকি অস্থায়ী শিরোনামও দিতে পারেন। এগুলো প্রতিবেদনের মূল ভাবনা বা ধারণায় আপনার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখা এবং সেই ধারণা অনুসরণ করা নিশ্চিত করে। আপনি যদি নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের তালিকা পরিকল্পনা করেন, তবে সেটি আপনাকে প্রতিবেদনের বিরক্তিকর একই বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করতে দেবে না।

এ ছাড়া ছবির মতো করে চিন্তা আপনার চূড়ান্ত প্রতিবেদনকে অন্যভাবেও সহায়তা করতে পারে:

- সম্পাদক বা বার্তা বিভাগের কাছে অনুসন্ধানের প্রস্তাব তুলে ধরতে সহায়তা করে; কেননা, আপনি আগেই জানেন, তাতে কোনো ধরনের মানচিত্র, ছক, গ্রাফ ও ছবির প্রয়োজন হতে পারে।
- দলগতভাবে কাজ করার ক্ষেত্রেও তা সহায়ক হয়; কেননা, পাতা বিন্যাসের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের কাজ সহজ হয়।
- প্রতিবেদনটির জন্য সবচেয়ে ভালো ছবি কোনটি হবে এবং কোথায় আপনি ফটোগ্রাফির সহকর্মীদের সহায়তা নিতে পারেন, সেই আলোচনা এবং দলগতভাবে কাজ করা এতে সহজ হয়।
- এটি আপনার মাথায় ছবি তৈরি করে দেয়, শব্দ দিয়ে যে চিত্রটি আপনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন।
- সঠিকভাবে বাছাইকৃত ছবি ও আকর্ষণীয় চার্টের মাধ্যমে পাঠকের কাছে লেখার চেয়ে বেশি ভালোভাবে বার্তা পৌঁছায়। প্রবাদ আছে, একটি ছবি হাজারো শব্দের সমান।

সম্পর্ক ও সমাপ্তি

প্রতিটি প্রতিবেদনের শুরু ও শেষটা ভালো হওয়া উচিত। যেকোনো লেখার শুরু ও শেষ অংশগুলোই সবচেয়ে শক্তিশালী হয়। সুন্দর সূচনা পাঠকদের টেনে নেয় এবং পুরো প্রতিবেদনটি পড়ে দেখার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। অধিকাংশ গবেষণায় দেখা গেছে, বিষয় যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, শুরুটা আকর্ষণীয় না হলে পাঠকেরা আর এগোন না। একইভাবে শেষটা হলো এমন এক ধারণা, যা পাঠক প্রতিবেদন শেষে মনে রাখেন।

শুরু করার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে আছে:
-একটি সূচনামূলক দৃশ্য তুলে ধরা
-একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রতিবেদনের মূলভাবের সারাংশ (পুরো প্রতিবেদন নয়)
-এর ফলাফল বা প্রভাব। এরপর আপনি পেছন ফিরে বলতে পারেন, এটি কীভাবে ঘটেছে।

সব ক্ষেত্রেই, প্রতিবেদনটি কী নিয়ে, সেটি বলতে পাঠককে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করাবেন না। প্রচলিত একটি ভালো নিয়ম হলো, সূচনায় কখনো প্রতিবেদনের ১০ শতাংশের বেশি রাখা উচিত নয়। কিন্তু এটিকে পাঠ্যবইয়ের ভাষায় 'বিলম্বিত সূচনা' হিসেবেও ভাববেন না। আপনার প্রতিবেদনের সূচনা হবে যেখানে এটি শুরু হয়েছে। আর এ জন্য ঘটনা বা তথ্যসমূহের দীর্ঘ তালিকা অপ্রয়োজনীয়। প্রতিবেদনের শেষে এসেও আপনাকে একইভাবে কাজ করতে হবে।

সন্তোষজনক সমাপ্তির মধ্যে আছে:

- আলগা প্রান্তগুলোকে বেঁধে ফেলা (চরিত্রগুলোর কী ঘটেছে বা আগামীতে কী ঘটতে যাচ্ছে)
- আমরা কেন আগ্রহী, তা বোঝাতে প্রতিবেদনের মূলভাবের সারাংশ আরেকবার বলা
- শিরোনামের মতো একটি আকর্ষণীয় সমাপনী বক্তব্য (কিকার) তৈরি করুন (যা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে)
- পটভূমির ওপর জোর দিন। বিষয়টিকে আবার তার নিজের অবস্থানে নিয়ে যান। ঘটনার সর্বশেষ অবস্থা এবং এ নিয়ে আশা-সীমাবদ্ধতার কথা পাঠককে জানান।
- চলে যান শুরুতেই সাক্ষাৎ হওয়া লোকজনের কাছে এবং তাঁদেরকেই সমাপ্তি টানতে দিন।
- শুধু সম্পূর্ণতার জন্য সমাপ্তি টানবেন না। আর ভিন্ন শব্দেও কখনো পাঠককে বলবেন না 'শুধু সময়ই বলে দেবে'। আপনি একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক, তাই কোনো নির্দিষ্ট সমাধান ছাড়া সমাপ্তি টানলে আপনার প্রতি পাঠকের আস্থা কমে যাবে।

আপনার প্রতিবেদনের গাঁথুনি জোরদার করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ: যেভাবে গল্প এক অংশ থেকে আরেক অংশে এবং এক অনুচ্ছেদ থেকে আরেক অনুচ্ছেদে যায়। একই রকম হবে এমন বর্ণনামূলক প্রতিবেদন তৈরির সবচেয়ে দরকারি কৌশল হলো:

- বিষয়বস্তু বারবার উল্লেখ করা।
- ধারণাগুলোকে জোটবদ্ধ ও স্পষ্ট রাখতে বেশি করে উপমা ব্যবহার। উদাহরণস্বরূপ, পরিবেশকে আপনি মানুষের শরীরের সঙ্গে তুলনা করে বলতে পারেন, শরীরের সব অংশকে যেমন একসঙ্গে কাজ করতে হয়, পরিবেশও সেভাবেই কাজ করে।
- ছবি, কোনো বস্তু, প্রবাদ বা আপনার অনুসন্ধানের সঙ্গে খাপ খায় এমন কিছু এমনভাবে ব্যবহার করুন, যেন তা প্রতিবেদনকে বেঁধে রাখার সুতার মতো কাজ করে।

জটিল যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে কতগুলো সহজ কথা পাঠককে আপনার সঙ্গে রাখার জন্য অত্যন্ত জোরালোভাবে কাজ করতে পারে। আগের অনুচ্ছেদের ধারাবাহিকতায় কোনো অনুচ্ছেদ ('এবং'), পথ পরিবর্তন হলে ('কিন্তু'), ফলাফল হলে ('তাই'), অনুসরণ হলে ('এরপর') এমন নির্দেশক শব্দ বেশি ব্যবহার করুন।

প্রাথমিক খসড়াটি আপনার নিখুঁত প্রতিবেদন হওয়ার কথা নয়, বরং এটি হবে দীর্ঘ। তাই চূড়ান্ত করার সময় অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে প্রতিবেদনের জন্য আগের সংগৃহীত তথ্য এখনো প্রযোজ্য কি না এবং পরে পাওয়া কোনো তথ্যের সঙ্গে তা বিরোধপূর্ণ কি না, তা যাচাই করা। একইভাবে নতুন তথ্য, বৈজ্ঞানিক প্রতিবেদন বা পরীক্ষার ফলাফলও আসতে পারে। ইন্টারনেটে আবারও অনুসন্ধান চালানো ভালো।

প্রতিবেদনটি সম্পাদনার সময় হয়তো কিছু অংশকে অতিরিক্ত বোঝা মনে হতে পারে। এগুলোকে আপনি প্রতিবেদন থেকে টেনে কোনো বক্স বা সাইডবারে নিতে পারেন। তবে সেরা প্রতিবেদনগুলোর খসড়া সাধারণত একাধিকবার করা হয়। আপনার লেখা সম্পাদনা কোনো বাড়তি বিলাসিতা বা মূল্যহীন কাজ নয়, বরং এটি আপনার সাধ্যমতো সবচেয়ে ভালো রিপোর্ট লেখার পদ্ধতির একটি অংশ। একাকী বারবার খসড়া ও সম্পাদনা কষ্টকর হয়ে পড়লে সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজের জন্য একজন সহকর্মী বা দলের সদস্যকে খুঁজে নিন। দলগত কাজ থেকেই ভালো ধারণা আসে।

সম্প্রচারের জন্য কীভাবে লিখবেন

দ্রষ্টব্য: *এটি সম্প্রচারের জন্য লেখার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা নয়। তবে এতে সম্প্রচারের জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে কী ধরনের ভাষা ব্যবহার এবং ভালো ধারাবর্ণনা কীভাবে তৈরি করতে হবে, সে বিষয়ে কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে।*

সব সম্প্রচার প্রতিবেদনেই ভিডিও ফুটেজ বা অডিও উদ্ধৃতি থাকে। একই ছবি ও উদ্ধৃতি পটভূমিভেদে অনেক ধরনের গল্প বলতে পারে। পারিপার্শ্বিক ভাষ্যের লক্ষ্য হলো আপনার গল্পটি শ্রোতাদের বুঝতে পারার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

একটি বুদ্ধিদীপ্ত লেখা খুবই সাধারণ কোনো ছবি বা গতানুগতিক উদ্ধৃতিকে নতুন আলোকে দর্শকদের কাছে হাজির করতে পারে। রেডিওতে ধারণকৃত বক্তব্যের আলোকে স্ক্রিপ্ট লেখা হলে সেটি হয় সবচেয়ে জোরালো। কিন্তু টেলিভিশনের ক্ষেত্রে রিপোর্টের প্রভাবের ৮৫ শতাংশ নির্ভর করে ছবির ওপর। বিরক্তিকর ছবি ও উদ্ধৃতির সমস্যা ভালো লেখায়ও দূর হয় না। এর মাধ্যমে দর্শক 'ধরা' যায় না এবং তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নেন। উভয় ক্ষেত্রেই ছবি বা রেকর্ড করা উদ্ধৃতিকে কেন্দ্র করে আপনার গল্প সাজাতে হবে। এই বিষয়কে বলা হয় 'কানের জন্য লেখা', 'ছবির জন্য লেখা', অথবা 'শব্দের জন্য লেখা'।

ক্যামেরায় ধারণ করেছেন এমন কিছু ঘটনাস্থলের খবর বা 'গ্রাউন্ড রিপোর্ট' দিয়ে আপনি শুরু করুন। এরপর আপনার নিজস্ব মন্তব্যে সাবধানে নির্বাচিত শব্দ ব্যবহার করুন এবং পরের ধাপে অগ্রসর হোন:

(১) রিপোর্টের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোয় জোর দিন।

(২) ছবি ও উদ্ধৃতি যেখানে শুধু কয়েকটি দিক তুলে ধরছে, সে রকম অবস্থায় ভারসাম্য আনার চেষ্টা করুন।

(৩) যে বিষয়গুলোতে আপনি দর্শকদের মনোযোগী করতে চান, সেগুলো নির্বাচন করে তার ওপর জোর দিন।

(৪) বিভিন্ন চিত্র ও উদ্ধৃতিগুলো সংযুক্ত করুন এবং সময়ের সঙ্গে এগুলো কীভাবে বদলেছে, তা ব্যাখ্যা করুন।

(৫) চিত্র ও উদ্ধৃতিগুলো প্রাসঙ্গিক করুন।

(৬) চিত্র বা উদ্ধৃতিগুলোর যে ব্যাখ্যা বা অর্থ বোঝাতে চান, সেগুলো যোগ করুন (তবে তথ্য বিকৃত করবেন না কিংবা বাদ দেবেন না!)।

উপস্থাপক বা রিপোর্টাররা এসব বিষয় মেনে চলতে পারেন এবং এগুলো মানা উচিত। তবে এর মানে এই নয় যে, তিনি সব সময়ই দর্শক ও সংবাদের মাঝখানে ফিল্টারের মতো থাকবেন বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেন। আপনার রিপোর্টে কোনো ব্যক্তির বক্তব্য প্রাসঙ্গিক হলে স্টেশনের নিজস্ব কণ্ঠ ব্যবহার বা নিজস্ব ভাষায় প্রচারের চেয়ে সেই ব্যক্তির কণ্ঠকেই সব সময় প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

ছাপা প্রকাশনা এবং সম্প্রচারমাধ্যমের পার্থক্য

ছাপা প্রকাশনা	সম্প্রচারমাধ্যম
পত্রিকায় পাঠকেরা যখন কিছু পড়েন, সেটি না বুঝলে তিনি পেছনে ফিরে গিয়ে আবার পড়তে পারেন।	সম্প্রচারিত সংবাদগুলো একবারই মাত্র দর্শকের সামনে দিয়ে চলে যায়। এ কারণে দর্শকদের মধ্যে বিস্তারিত মনে রাখার চেয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সম্প্রচারিত সংবাদে পুরো প্যাকেজের ধরন সে কারণেই বেশ গুরুত্বপূর্ণ।
পড়ার সময় ভুলগুলো চোখে পড়ে এবং পাতাতেই থেকে যায়।	সম্প্রচারমাধ্যমে দর্শকেরা প্রথমবারেই ভুলটি ধরতে পারেন অথবা কখনোই তারা ভুল ধরতে পারেন না।
পাতা ধরে পড়ার সুবিধার্থে সেখানে শিরোনাম, ক্যাপশন ও অনুচ্ছেদের মতো চিহ্নগুলো স্পষ্টভাবেই থাকে।	সম্প্রচারের মাঝামাঝি দেখতে এসে সেখানে কী চলছে, তা বোঝা নতুন দর্শকদের জন্য বেশ কষ্টকর।
পাঠকেরা পড়া বন্ধ রেখে চলে যেতে পারেন এবং অন্য কিছু করতে পারেন। আবার যখন তাঁরা ফিরে আসবেন, কোনো কিছু না হারিয়ে যেখানে পড়া থামিয়েছিলেন, সেখান থেকেই আবার শুরু করতে পারেন।	রেকর্ড করা না হলে বা ইন্টারনেটে না পাওয়া গেলে সম্প্রচারের ক্ষেত্রে দেখা থামিয়ে দিয়ে অন্য কাজ করা সম্ভব নয়।
ছবি ও মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে পারে। অনলাইন প্রকাশনা তাদের আস্থা বাড়াতে এই সুবিধা কাজে লাগাতে পারে।	সম্প্রচারিত সংবাদে বক্তব্যের পক্ষে দর্শকদের আরও বেশি প্রমাণ দেওয়া হয় (উদাহরণ: শব্দ, ছবি), যা একে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে (এমনও শোনা যায়, 'এটি অবশ্যই সত্য: আমি টিভিতে দেখেছি')। একই কারণে, এটি সত্যকে আরও জোরালোভাবে বিকৃত করতে পারে।
পড়তে বেশি সময় লাগলেও লিখিত রিপোর্ট থেকে পাঠক অনেক বেশি বিস্তারিত তথ্য পেতে পারেন।	সম্প্রচারিত সংবাদের জন্য উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে বৈচিত্র্যময়, দ্রুত চলা প্যাকেজ বোঝার জন্য ভালো সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন।

পডকাস্ট ব্যতীত সম্প্রচারিত সংবাদ শুধু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। এখানে পত্রিকার মতো বস্তুগত কোনো বিষয় থাকে না।

এসব কারণে সম্প্রচারিত সংবাদ এবং দর্শকদের এগুলো গ্রহণ করার ধরন থেকে বোঝা যায়, সম্প্রচারের জন্য যে ভাষায় আগাতে হয়, সেটি প্রিন্ট মিডিয়ায় ব্যবহৃত ভাষা থেকে ভিন্ন। অবশ্য মাধ্যম যা-ই হোক না কেন, সংক্ষিপ্ত সময় ও জায়গার মধ্যে আপনাকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাই 'অতি গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় তথ্য' অথবা ধারণা খুঁজে নিন, যা দ্রুততম সময়ে আপনার দর্শকদের ধরতে পারবে। আর এটি ব্যবহার করুন আপনার অনুসন্ধানী প্যাকেজের শুরুতেই।

নোট

কনরাড অ্যাডেনাওয়ার স্টিফটুং (কেএএস) একটি জার্মান রাজনৈতিক ফাউন্ডেশন। এটি গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রসারের পাশাপাশি মানবাধিকার বাস্তবায়নে বৈশ্বিক প্রবক্তা। সে কারণে কেএএস প্রশিক্ষণ এবং এর পরবর্তী শিক্ষার মাধ্যমে অবাধ ও স্বাধীন মিডিয়া, রাজনৈতিক দল, পার্লামেন্ট ও সামাজিক সংগঠনের প্রতি সমর্থন জানায় কিংবা সহায়তা করে। সমাজের অগ্রসর বা অভিজাত ব্যক্তিদের মুক্তমন, স্থিতিশীলতা ও দক্ষতার ওপর সেই সমাজের সাফল্য নির্ভর করে। কেএএস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল মানসিকতার ভবিষ্যৎ অগ্রসর নাগরিকদের সমর্থন করে।

© কনরাড অ্যাডেনাওয়ার স্টিফটুং, মিডিয়া প্রোগ্রাম এশিয়া

জালান বেসার, এআরসি ৩৮০, #১১-০১, ২০৯০০০, সিঙ্গাপুর
ফোন : +৬৫ ৬৬০৩ ৬১৮১ | ই-মেইল : media.singapore@kas.de
www.kas.de/medien-asien/en | facebook.com/media.programme.asia

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার বিষয়ে কোনো পর্যালোচনার জন্য কপি এবং অন্য কোনো অনুসন্ধানের জন্য প্রকাশকের কাছে অনুরোধ পাঠাতে হবে। বিষয়, মতামত ও বাইরের সূত্রের ক্রস রেফারেন্সের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে প্রদায়ক এবং তাদের ভাষ্য যাতে কনরাড অ্যাডেনাওয়ার স্টিফটুংয়ের নীতি ও মতের প্রতিফলন না-ও হতে পারে।

www.investigative-manual.org

বাংলা অনুবাদ
কাজী আলিম-উজ-জামান

অনুবাদ পর্যালোচনা
কামাল আহমেদ

নকশা ও বিন্যাস © জুলিয়েন সুইটালা

বাংলাদেশে মুদ্রণ : ট্রান্সপারেন্ট